শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী

PRESENTED
৭/২৫৭
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

দ্বিতীয় লহরী

LIBRARY
৭/২৫৭
BANARAS

দ্বিতীয় খণ্ড

গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

PRESENTED

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী

~~কারুণ্যামৃত-ধারা~~

দ্বিতীয় লহরী

দ্বিতীয় খণ্ড

LIBRARY
৫।২৮৭

গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

সম্পাদক, মহানাম সম্প্রদায়

প্রণীত

ভূমিকা লেখক

ডাঃ মহানামব্রত দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ

অহেশ লাইব্রেরী।
পুস্তক-বিক্রেতা।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২

প্রকাশক

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী

৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা

সন ১৩৫৬ সাল

সীতানবমী,

হরিপুরুষাব্দ ৭৯

মাধুকরী—আড়াই টাকা মাত্র

১ম ২য় খণ্ড একত্রে বাঁধাই

পাঁচ টাকা মাত্র

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

হরিকথা	১।০	হরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল	৸০
সংকীর্ত্তন পদামৃত	১৲	প্রেমের বাণী	।৵০
চন্দ্রপাত	৵০	মহানাম মাধুরী	।৵০
চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু	১৲	তত্ত্বমঞ্জরী	।৵০
মহামৃত্যু রঙ্গ	১৲	বন্ধুলীলা তরঙ্গিনী ১ম খণ্ড	৩৲
বন্ধু করুণাকণিকা	।৵০	„ „ ২য় খণ্ড	২॥০
বন্ধুস্মরণ মঙ্গলম্	॥০	দুইখণ্ড একত্রে	৫৲

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন—পোঃ শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর।
মহাউদ্ধারণ মঠ—১৯, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।
শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম—পোঃ ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ।
বয়েজ লাইব্রেরী—পোঃ জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ।
ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী—পটুয়াটুলী, ঢাকা।

শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস কর্ত্তৃক শ্রীপতি প্রেস, ১৪নং ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

৭।২৪৭

নিবেদন

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিনীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইলেন। স্ব-প্রকাশ প্রভুরই মত তাঁহার কথা, যখন স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হইবেন, তখনই হইবেন। কাহারও কিছু করিবার সামর্থ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের লাভ ঐ সেবাভাগ্যটুকুই।

গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহে আমার বিপুল ঋণের কথা আমি প্রথম খণ্ডের নিবেদনেই সব স্বীকার করিয়াছি। তৎপরে অধিক বলিবার কথা এই যে, এই খণ্ডে চম্পটী ঠাকুরের গৃহত্যাগ সম্পর্কিত প্রায় সমুদয় কাহিনীই পরমপ্রিয় ডাক্তার হরিহর বন্দোপাধ্যায় দাদা-জীবনের কৃপায় এবং আলমপুর প্রভুর পদার্পণ ও লীলাখেলার কাহিনী ঐ গ্রামের রায় পরিবারের শ্রীযুত বিনয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুত বকুলাল বিশ্বাস মহাশয় অনেক ধনে ধনী। কৃপণতা করিয়া কিছুই দেন না। অতর্কিত ভাবে কখনও দুই একটি কথারত্ন বাহির হইয়া পড়ে। অসাবধানে পাইলেই তাহা চুরি করিতে আমরা কখনও কালবিলম্ব করি না।

পূজ্যপাদ রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দাদাজীবন গত অগ্রহায়ণ মাসে নিত্যলীলায় প্রভুবন্ধুর নিত্যসেবায় প্রবেশ করিয়াছেন। অনেককাল ধরিয়া অনেক কথা তিনিও তালা-চাবি দিয়া রাখিয়াছিলেন। নির্য্যাণের পূর্ব্ববর্ত্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা তাঁহার হৃদয় দুয়ারের কপাটের অর্গল খুলিয়া গিয়াছিল। অনবরত বন্ধুকথা কহিয়া আমাদিগকে অমূল্য রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন। প্রভুর ইচ্ছা অনুকূল থাকিলে ক্রমে ভক্তগণ তাহার আস্বাদন পাইবেন।

বাংলা ১৩০৯ সালে মৌনী হইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু ফরিদপুর গোয়ালচামট কুটীরাবদ্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লীলা, কারুণ্যামৃত ধারায় বর্ণিত

হইবে। আরও দুই খণ্ডে সেই পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিব, আশা করি। তারপর মহাগম্ভীরার লাবণ্যামৃতধারা। তাহা যদি এ পাপ তাপদগ্ধ ব্যাধিক্লিষ্ট দেহ দ্বারা লেখান, তবে সে তাঁহার মহাপতিত পাবন-লীলারই আর একটা মহা দৃষ্টান্ত হইবে।

এই খণ্ডে আমরা একটু ক্রমভঙ্গ করিয়াছি। পূজ্যপাদ চম্পটী ঠাকুরের অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ও কঠোর তপস্যার মধুর কাহিনী ধারা-বাহিক আস্বাদনে যাহাতে বাধা না ঘটে, সেইজন্য কিছু সময় ভগবানকে ছাড়িয়া ভক্তকেই অনুসরণ করিয়াছি। "মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা" তাঁহার এই নিজ শ্রীমুখবাক্য অনুসারে ইহাতে বন্ধুর ও বন্ধুর ভক্তগণের প্রীতিই হইবে মনে করি। রমেশচন্দ্রের কৃপালাভের মধুমাখা কাহিনীও আমরা ক্রম ছাড়িয়া উল্লাসাতিশয্যে বলিয়াছি। তৃতীয় খণ্ড হইতে আবার ক্রমধারানুসারেই লীলা-নায়কের পদাঙ্ক অনুসরণ করিব—এই সাধ। ভক্তগণ কৃপা দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করিলেই এই সাধ পূর্ণ হইতে পারে। নিবেদনমিতি—

শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন
ফরিদপুর
বৈশাখ ১৩৫৬

সকলের কৃপা-ভিখারী
গোপীবন্ধু দাস

LIBRARY
৭।২৫৭

"জয় জগদ্বন্ধু হরি"

ভূমিকা

"তোরা আমায় স্মরণ করিস্ আর নাই করিস্
আমি তো'দিগকে নিত্য চিরকাল স্মরণ করবো"

—বন্ধুবাণী

লীলা তরঙ্গিনীর ভূমিকা রচনা দুরূহ কার্য্য। তরঙ্গময়ী নদীটি, সম্পত্তি হইল সে উচ্চ পর্ব্বতমালার, কিন্তু পরিণতি হয় তার মহা-সাগরে, আর বহিয়া চলে সে অনুচ্চ ভূমি হইতে ক্রম অনুচ্চ ভূমিতে, কত না আঁকা বাঁকা পথ ঘাট ধরিয়া। লীলা তরঙ্গিনীও তদ্রূপ। ইহা ব্রজগিরির নিকুঞ্জ-কন্দরেরই নিত্য সম্পদ, ইহার পরিণতি মহাউদ্ধারণ মহাসমুদ্রের মহাগম্ভীরার গভীরে, কিন্তু প্রবাহটি বহিয়া যায় অনিত্য মর্ত্ত্য লোকের মধ্য দিয়া, নব নব পথ ধরিয়া। যাহা ছিল গোলোকের গুপ্ত পাটে, তাহাই এল যমুনাজীর তটে, তাহাই বিকাইল নদীয়ায় হাটে মাঠে, আজ আবার তাহাই বহিয়া চলিয়াছে সর্ব্ব নিম্ন তলে বুনা ডোমদের ঘাটে ঘাটে। লীলাসুরধুনী কোন্ দিক হইতে যে কোন্ দিকে প্রবাহিত হইবেন, তাহার দিগ্‌নির্ণয় বা ভূমিকা সঙ্কলন দুঃসাধ্য কার্য্যই বটে।

অই যে শান্তিপুর নদীয়া, অম্বিকা কাটোয়া, পুরীধাম, ব্রজধাম, দক্ষিণদেশ গৌড়দেশ বারংবার হাঁটাহাঁটি; এই যে ডাহাপাড়া গোবিন্দ-পুর, ব্রাহ্মণকান্দা ফরিদপুর, পাবনা বাকচর, বুনা বাগদী ডোমদের ঘর নানাতীর্থ পথঘাট, নবদ্বীপ ব্রজবাট পুনঃ পুনঃ ছুটাছুটি, একবার হেথায় একবার সেথায়, ঘুরে ফিরে গতাগতি, ইহা কোন্ নীতি বা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, জানিতে সাধ হয় কিন্তু জানা যায় না। কেন এখান হইতে

সেখানে, সেখান হইতে ওখানে ঘন ঘন চলাফিরা করেন, তাহার কারণ কে জানে? বুঝিবা, নিজেও জানেন না। তাই প্রবহমানা তরঙ্গিনীর ধারা অনুসরণ করা কঠিন কার্য্য। তবে যাঁহারা প্রেমবলে অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পদধূলি শিরে তুলিয়া কথঞ্চিৎ অনুস্মরণ করি মাত্র।

লীলা তরঙ্গিনীর দুইটি নীতি দেখি। একটি নিম্নভূমির দিকে প্রধাবন, আর একটি পতিত ভূমিকে প্লাবন। তৃণাদপি নিম্নভূমিটি শুদ্ধ ভক্তি-রসেরই। সেই রস তাঁহাকে নিজাভিমুখে টানে, হাঁটাহাঁটি ছুটাছুটি করাইয়া লয়। পতিত ভূমি কিন্তু তাঁহাকে খোঁজ করে না। তিনিই তাহা অনুসন্ধান করিয়া ফিরেন। ভক্তিভূমিতে গমনাগমন আস্বাদন লোভে, পতিত ভূমিকে প্লাবন আনন্দ বিতরণ আশে। একটি, রসের উন্মাদনায়, অপরটি কারুণ্য শক্তির প্রেরণায়, লীলা তরঙ্গিনীর দুইটি কূলই নিয়ত কলধ্বনিময়। প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন, আর স্ব-স্বরূপানন্দ বিতরণ—দুই তটের মাঝে লীলা-তটিনী নাচিয়া চলে। কবিরাজ গোস্বামিপাদের অতুলনীয় ভাষায়,—

প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গে ভক্তি জীবে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম॥

প্রীতি-রসাস্বাদকত্ব ধর্ম্ম শ্রীহরির নিজ সম্পত্তি। ইহার বিকিকিনি আরম্ভ হইয়াছে নিকুঞ্জে, পরিণতি পাইয়াছে মহাগম্ভীরায়। কারুণ্য শক্তির প্রকাশ ভক্তদুঃখ অসহনে, ইহার পরিণতি নিখিল জীব-দুঃখ-কাতরতায়। "উঃ জীবের জন্য এত কষ্ট" এই কাতরোক্তি উচ্চারণে। এই দুইটি কার্য্য তাঁহার লীলার গতিপথ নিয়ন্ত্রনে হেতু। এই হেতুদ্বয় তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবেরই অন্তর্গত। বাহিরের কিছু নয়। তবেই

হইল, লীলা তরঙ্গিনীর সত্তা স্ব-তন্ত্র। ইহা নিত্যকালই স্বরাট—স্বয়ং রাজতে। ইহা সর্ব্বতোভাবেই স্বাধীন বা স্বয়ের ইচ্ছাধীন। তাইতো স্বয়ং শ্রীহরিকথায় লিখিয়াছেন,—

"ইচ্ছাধীন অবতার কি ভয় রে॥"

লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল ব্রজ-রসানন্দে বিভোর হইয়া বিচার কুশল জ্ঞানীদের প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

পরমিমমুপদেশমাদ্রিয়ধ্বং
নিগম-বনেষু নিতান্ত চারখিন্নাঃ।
বিচিনুত ভবনেষু বল্লবীনাং
উপনিষদর্থমুদূখলে নিবদ্ধম্॥

হে জ্ঞান-বীরগণ, শ্রুতি-স্মৃতিরূপ শাস্ত্রারণ্যে বিচরণ করিয়া আপনাদের মন যদি নিতান্ত খিন্ন হইয়া থাকে, তবে এই একটি উপদেশ গ্রহণ করুন—গোকুলে গোয়াল পাড়ায় এক গোপনারীর দুয়ারে আপনাদের উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য বস্তু উদূখলে নিবদ্ধ হইয়া আছেন। গিয়া দেখিয়া আসুন।

বস্তুতঃ, "কং প্রতি কথয়িতুমীশে, সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু" কাহাকেই বা বলিব কেই বা প্রতীতি করিবে—অনাদির আদি গোবিন্দ পতিতপাবন সাজিয়া বুনো বাগদী ডোমদের দুয়ারে আপনি পতিতের আরতি করিতেছেন। কারুণ্যামৃত ধারায় ভাসিয়া করুণা-নিলয় হীন পতিতের ঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছেন! যেন দায়ে ঠেকিয়াছেন। নিজেই লিখিয়াছেন, "জীবে দায়ী হও।"

জীব উদ্ধারণের দায়িত্ব নিজেই লইয়াছেন। সহায়ক তাহার একটি বস্তুমাত্র—শ্রীহরিনাম। নামের যে কী শক্তি আপনার স্বরূপে মূর্ত্তিমন্ত-রূপেই তাহা দেখাইয়াছেন। প্রিয় হরিদাস মোহন্ত, অতুলচন্দ্র চম্পটী প্রমুখ নাম-রসিক ভক্তগণের জীবনের মধ্য দিয়া জীবন্ত করিয়াই

তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। নাম যে কেবল দুর্লভ প্রেমরত্ন লাভের উপায়, তাহাই নহে, জাতি সংগঠনে, মানবত্ব প্রতিষ্ঠায়, "লোকসংগ্রহে" ইহা যে এক অত্যদ্ভুত শক্তিশালী অমোঘ অস্ত্র তাহাও সমাজের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

কবে যে প্রভুবন্ধুর প্রদর্শিত পথে ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিপালনে নর-নারীর দেহমন পরিপুষ্ট হইবে, কবে যে হরিনাম মধুরিমা আস্বাদনে সকল জীবের ক্ষুধার্ত্ত আত্মা পরিতুষ্ট হইবে, কবে যে এই দুইয়ের সম্মেলনে এক বিরাট সামঞ্জস্যময় মানব সমাজ গড়িয়া উঠিবে—তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। আমরা কেবল তাঁহারই নিরুপম ভাষার দয়াল ঠাকুর শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই,—

হা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মহাউদ্ধারণ।
পতিত নিস্তার কর জীব অকিঞ্চন॥
[কোন দোষ নাই হে] [কীট কুহক জাত]
[কীট গুরু-তাপ-তাত] [কীট স্বনাম-বিখ্যাত]
[জেনেও কি জান না ত ?]

হে প্রভো! গুরুতর তাপে সন্তাপিত চির বহির্ম্মুখ বদ্ধজীব স্বনাম বিখ্যাত "কীট" তাহা তো তোমার অজ্ঞাত নহে। তার দোষ কি ? তুমি মহাউদ্ধারণ। অকিঞ্চন পতিত জীবকে নিস্তার তোমাকেই করিতে হইবে। তোমার পতিতপাবন লীলার জয় হউক।

দাসাভাস—
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

মহাউদ্ধারণ মঠ
অক্ষয় তৃতীয়া
১৩৫৬

সূচীপত্র

বিষয়			পত্রাঙ্ক
মিলন বিরহ	...	...	২২৫
শ্রীধামে ধামেশ্বর	...	...	২২৭
চন্দ্রে চন্দ্র	...	...	২৩০
অবগাহন মাধুরী	...	...	২৩৩
মাতৃ মিলন	...	...	২৩৫
অজানা পথে	...	...	২৩৯
ব্রজ অভিমুখে	...	...	২৪১
জয়পুরে শ্রীশ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ	...	...	২৪৩
শ্রীবৃন্দাবনে	...	...	২৪৭
শ্রীকুণ্ডতীরে	...	...	২৫১
সরযূ নদী	...	...	২৫৭
ভাই বোন	...	...	২৬০
অধৃষ্য ও অধিগম্য	...	...	২৬৪
অস্বতন্ত্র ইব	...	...	২৬৫
মহাভাবের ঠাকুর	...	...	২৬৯
"দেখুন কি সুন্দর দেখায়"	...	...	২৭৪
দুঃখীরামের ধ্যান	...	...	২৭৬
স্বরূপ দর্শন	...	...	২৭৮
নন্দ ঘোষ	...	...	২৮১
"হাভাতে গোয়াল"	...	...	২৮২
কীর্ত্তনোল্লাস ও পদরচনা	...	...	২৮৩
মাসব্যাপী কীর্ত্তনোৎসব	...	...	২৯০
সাত সম্প্রদায়	...	...	২৯৪
নগর পরিভ্রমন	...	...	৩০০

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক
বাগ্‌দী পাড়া	...	...	৩০৩
জয়ধ্বনি	...	...	৩০৫
হিন্দু সমাজ ও বুনাজাতি	...	...	৩০৭
রজনী সর্দ্দার	...	...	৩১০
প্রভু ডাকিয়াছেন	...	...	৩১৩
হরিদাস মোহন্ত	...	...	৩১৭
মোহন্ত সম্প্রদায়	...	...	৩২১
অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ	...	...	৩২৬
গোপাল মিত্র	...	...	৩২৯
'যত গান গাইতে পার"	...	...	৩৩১
বাকচরের জাগরণ	...	...	৩৩৫
বাকচর পদার্পণ	...	...	৩৩৭
প্রভু এসেছেন	...	...	৩৩৯
শুদ্ধ মাধুর্য্য	...	...	৩৪১
হুঁহু লীলা	...	...	৩৪৩
অন্নদা দত্তের অনুভূতি	...	...	৩৪৫
নব গৌর	...	...	৩৪৬
"মানুষ গণনার মধ্যে না পড়ি"	...	...	৩৪৯
সিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য	...	...	৩৫১
সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী	...	...	৩৫২
দুই প্রভু	...	...	৩৫৪
রাই মাতা	...	...	৩৫৭
চরণতলে চিহ্ন	...	...	৩৬০
সর্ব্বসুখ সান্ন্যাল	...	...	৩৬২
কীর্ত্তনোন্মাদনা	...	...	৩৬৪

বিষয়			পত্রাঙ্ক
শিবের আনন্দ	...	...	৩৬৬
"আমার জায়গা ছিল না"	...	...	৩৬৭
ডোম পল্লী	...	...	৩৭৩
গোকুলানন্দ	...	...	৩৭৯
শ্রীহরকুমার রায়	...	...	৩৮২
আড়া মেছ বাড়ী	...	...	৩৮৫
"চির সন্ন্যাসী তুই"	...	...	৩৮৮
বাজ রে শিঙ্গা	...	...	৩৯০
"কিঞ্চিৎ পত্র প্রসাদ আছে"	...	...	৩৯১
বৈরাগ্য ভাগ্য	...	...	৩৯৩
ধাবমান শ্রীকৃষ্ণ	...	...	৩৯৫
"হরেকৃষ্ণ, এদিকে"	...	...	৩৯৮
নামী নাম ও প্রেম	...	...	৪০০
দীনবেশ ও তপস্যা	...	...	৪০৩
অতুলের ব্রতপূর্ণ	...	...	৪০৮
রামবাগানে পদার্পণ	...	...	৪১০
মহাপুরুষ দর্শন	...	...	৪১৪
"শিব ওকে নাও"	...	...	৪১৫
"আমের লোভে"	...	...	৪১৯
সমস্যা ও সমাধান	...	...	৪২৫
ভক্তোচ্ছিষ্ট গ্রহণ	...	...	৪২৮
চাঁড়ালের ভাত খায়	...	...	৪৩০
জগার নাম ল'বি	...	...	৪৩২
শিব শিবই	...	...	৪৩৪
রমেশচন্দ্রের পথানুসন্ধান	...	...	৪৩৬
শুভদর্শন ও কৃপাবর্ষণ	...	...	৪৩৯
"ইহাকে বলে চন্দ্রভাল"	...	...	৪৪৩

জয়

জগজন বন্ধু সেহ জগমন মোহন।
হরিপুরুষ সেহ পুরুষ পুরাণ॥
মহাউদ্ধারণ সেহ পরশ রতন।
মহা ভাব সেহ প্রেমাধিরঞ্জন॥
রসরাজ সেহ রস পীযূষ রমণ।
মহানাম সেহ ত্রিভুবন পাবন॥
জয় প্রেম কল্পতরু জগক্ষেম ধারণ।
জয় প্রাণ জগদ্বন্ধু কালিন্দী† মনধন॥

---

† ইনি পূজ্যপাদ রমেশচন্দ্র শর্ম্মার অনুগত শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের পরম কৃপাপ্রাপ্ত, প্রাচীন ভক্ত। ইঁহার নাম শ্রীকালীমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রভু আদরে ডাকিতেন, "কালিন্দীমোহন।"

আবির্ভাব পীঠ—শ্রীশ্রীডাহাপাড়া ধাম

শ্রীশ্রীবিল্ববৃক্ষ

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম, ডাহাপাড়া

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী

দ্বিতীয় লহরী

কারুণ্যামৃতধারা

মিলন—বিরহ

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে.

শ্রুতি

বেদান্ত-বেদ্য চিন্মাত্র ব্রহ্মচৈতন্য একটি "সর্ব্বগত স্থানু অচল" সত্তা। ভক্তের ভালবাসার ধন আনন্দঘন-শ্রীভগবান কিন্তু স্বধাম-গত ক্রীড়াময়, সচল, লীলা-পুরুষোত্তম-বিগ্রহ। শ্রীভগবানও যেমন সচল, তাঁহার লীলাও তেমনি সচল, নিরন্তর দোদুল্যমান। লীলাকে দোলায় রস। লীলায় অ-স্থিরতা আনে বিরহ ও মিলনের টান। লীলাখেলার অন্তরে আছে একটা বিরহ মিলনের রসের দোলা। ঐ দোলাতেই লীলার দোলন। কোনও ভক্তের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহার আর্ত্তি বর্দ্ধন করা, আবার কোনও ভক্তের নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে উদয় হইয়া তাঁহার তপ্ত অশ্রুধারাকে সার্থক করিয়া তোলা—ইহাই তো খেলা। ভক্ত ভগবানের মধ্যে ইহাই মাধুর্য্যময় লীলাকৌতুক। "কুতুকী" ভগবানের ইহা ছাড়া যেন আর কোন কাজ নাই।

অখিল রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীবন্ধুসুন্দর স্বীয় নিত্য কিশোর মূর্ত্তিখানি বিরহীজনের ধ্যানের ধন হইবেন বলিয়াই যেন স্বেচ্ছায় ভক্ত বকুলালকে লইয়া আলোকচিত্র তোলাইলেন। মুখ্যতঃ এই কার্য্য সাধনের জন্যই যেন রাজর্ষি বনমালী রায়কে বিষাদে ডুবাইয়া ট্রেন হইতে পলায়নপর হইয়া কলিকাতা আসেন। আবার বকুলালকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া, চিত্র তোলাইয়া অকস্মাৎ একদিন পুনরায় নিরুদ্দেশ হন। কোথায়? কে বলিবে! বন্ধুচাঁদ কখন কোন্ আকাশে উদিবেন তাহা লীলা-শক্তিই জানেন।

বন্ধুর বিরহ বেদনায় বকুলাল বড়ই ব্যথিত হইতে লাগিলেন। মিলন্ বিচ্ছেদের খেলাই যাঁহার চির স্বভাব তাঁহার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। প্রিয় জনদের পক্ষে কিন্তু ইহা অসহনীয়। প্রিয়-জনের অন্তরে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। কিন্তু ভক্ত যে, সে অন্তরের ধনকে নিরন্তর বাহিরেও দেখিতে চায়—বিশেষতঃ যখন সে বিচ্ছেদ-বেদনায় ব্যথিত থাকে। তাই বুঝিবা, নিজ অভিন্ন স্বরূপ যে প্রতিকৃতি, তাহা প্রিয়জনদের হাতে দিয়া বন্ধুসুন্দর কতকটা মুক্ত হইলেন।

ব্রজরাজনন্দন একদিন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীদিগকে বলিয়া-ছিলেন,—

শ্রাবনাদ্দর্শণাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥

কথাশ্রবণ, দৈবাৎ দর্শন, রূপধ্যান এবং অনুকীর্ত্তন দ্বারা আমাতে

যেরূপ ভাব জন্মে, আমার নিকটে অবস্থানে সেরূপ ভাব হয় না। অতএব তোমরা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন কর।

আজ যেন সেই ভাবেই প্রভু বন্ধুসুন্দর প্রিয়জনকে না বলিয়া পলায়ন করিতেছেন। নিজ শ্রীমূর্ত্তির আশ্রয়ে ভক্তগণের শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান এবং কীর্ত্তনের স্ফুরণ করাইয়া দিয়া স্বয়ং অন্তরালে চলিতেছেন। বিরহাতুর ভক্তগণের সম্বল এখন শ্রীমূর্ত্তিই। শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়াই তাঁহারা এখন তাঁহার মোহন রূপগুণের কথা, প্রাণ-ঢালা ভালবাসার কথা, চিত্তাকর্ষী সঙ্গীতের মাদকতার কথা আলোচনা ও আস্বাদন করিতেছেন। বকুলাল এখন নিজের সঙ্গে প্রিয় জগতের চিত্রপটখানি কেবল দেখেন, আর অশ্রু-নীরে ভাসেন।

শ্রীধামে শ্রীধামেশ্বর

স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? স্বমহিম্নীত।

শ্রীশ্রীবন্ধুচন্দ্র কলিকাতা হইতে অস্তমিত হইয়া হঠাৎ শ্রীধাম ডাহাপাড়ায় উদিত হইলেন। মাত্র দেড়বৎসর বয়সে মাতৃ-বিয়োগের পর সাধের ধাম ডাহাপাড়া ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি ছাড়িলে কি হইবে ? শ্রীধাম তো তাঁহাকে ছাড়েন নাই। ধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হৃদয় ভরিয়া তাঁহাকে ধরিয়াই রাখিয়াছেন। সুদীর্ঘ ষোড়শবৎসর প্রোষিতভর্ত্তৃকা নায়িকার মত শ্রীধাম

শ্রীধামেশ্বরের লীলার করুণ স্মৃতিগুলি বক্ষে জড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আজ বুঝি বিরহিনী কবরীবন্ধন করিবেন।

বিগত ষোল বৎসর মধ্যে ডাহাপাড়া পল্লীর বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাসাবাটীতে একখানিও গৃহ নাই। সবই অরণ্যে পরিণত। বাসগৃহটী. রাধাগোবিন্দের সেবা-কুঞ্জটি এখন সবুজ দুর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত। জন্মভিটার উপর দেবী ক্ষমাময়ী কর্ত্তৃক রোপিত ডালিম গাছটি আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। যাহার তলে ন্যায়রত্ন মহাশয় পূজাহ্নিক করিতেন, বন্ধুগোপাল হামাগুড়ি খেলিতেন, সেই বিল্ববৃক্ষরাজ ধ্যানমগ্ন যোগীর মত অবস্থান করিতেছেন। নবাবদের ক্রীড়া-উদ্যান গুলি পদ্মহীন পদ্মপুকুরের মত কেবল নামে মাত্র আপন সত্তা রক্ষা করিতেছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন প্রাচীর, স্থানে স্থানে শেওয়ালা-ধরা ইষ্টকের স্তূপ। মধ্যে মধ্যে কণ্টকের বন। আড়ালে আড়ালে জীর্ণ পতিত বাড়ীগুলি লুক্কায়িত। উঁচু উঁচু দেওয়াল। ফাটলে ফাটলে বটের শিকড়। আঁধার-ঘেরা কোঠায় ভুজঙ্গ বাসা বাঁধিয়াছে। বাড়ীগুলি যে একেবারে জনমানব শূন্য, তাহা নহে। লোক আছে। কিন্তু আছে বলিয়া মনে হয় না। শান্ত নিঝুম। প্রশান্ত বদন বহু বৃদ্ধবৃদ্ধাকে দেখা যায়, যাঁহাদের চিত্তপটে ন্যায়রত্নদুলালটির ছবি এখনও সমুজ্জল-ভাবে অঙ্কিত আছে। সেই মধুর রূপলাবণ্য, সেই প্রাণ-হরা ভাবভঙ্গি সেই লালালিপ্ত পঙ্কজমুখের হাস্য মাধুরীর কথা এখনও তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া বলেন। বামাসুন্দরীর ছোট ছেলেটির কল্যাণ কামনা করিয়া ন'মা ক্ষমাময়ী দেবী এখনও কম্পিত

করে শিবলিঙ্গের শিরে সচন্দন বিল্বপত্র সমর্পণ করেন। ফলফুল, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, নরনারী, বালকবালিকা, কৃষক, মজুর, সাধক, পথিক, ডাহাপাড়ার যাহার দিকে চাই, সকলের মাঝেই ব্রজের সুষমা ফুটিয়া পড়ে। তাহাই ভাবুক দর্শকের নিকট স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করে—ধামের নায়ক কখনও ধামছাড়া নহেন।

শ্রীধামের চির আরাধ্য দেবতা দীর্ঘ বিরহের পর আজ অকস্মাৎ সমুদিত হইয়াছেন। নবনটবরের মত নব কিশোর সেই বিল্ববৃক্ষটির মূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্বীয় আবির্ভাব পীঠ, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সেই বাস্তু ভিটাটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। শাখাপত্র দোলাইয়া বিল্ববৃক্ষ নবীন অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছে। সকল বৃক্ষ হইতে পাতা ঝরিয়া, ফুল পড়িয়া চরণপূজা করিতেছে। শাখীশাখে পাখীগণ আপন আপন স্বরে বিশ্বদেবতার স্তুতিগাঁথা গাহিতেছে। প্রাপঞ্চিক প্রকৃতির আদর আপ্যায়নে প্রপঞ্চাতীত দেবতা ক্রমে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

একটি একটি করিয়া ক্রমে বহুলোক জমিতেছে। বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী সবাই আসিয়া দেখিতেছে। শুভ্রবস্ত্রে ঢাকা-তনু একটি সৌন্দর্য্য প্রতিমা ন্যায়রত্নের ভিটার উপর বসিয়া আছেন। অচেনা, তবুও যেন কতকালের পরিচিত আপন জন। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে, আর ভাবিতেছে "কে ইনি!" নীরবে ভাব বিনিময় চলিতেছে।

কিছু সময় পরে বন্ধুসুন্দর আপন মনে সে স্থান ছাড়িয়া

উঠিতেছেন, এমন ভাবে উঠিতেছেন যে কেহই কোন কথা তুলিবার অবসর পাইতেছেন না। সকলেরই চিত্ত তোলপাড় করিতেছে। বুঝিবা এই সেই। নীরব প্রেমের নীরব রাগিনী বাজিতেছে।

চন্দ্ররে! চন্দ্র!

"চন্দ্র! চন্দ্র!

বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে চন্দ্রশীলের দুয়ারে কে ডাকিল!

"চন্দ্ররে! চন্দ্র!"

এমন মোহন কণ্ঠ, এমন আদর মাখা ডাক, মানুষ কোনও দিন শোনে নাই। মন্ত্র-মুগ্ধবৎ চন্দ্র সে ডাক শুনিয়া ঘরের বাহির হইল। বাহির হইয়া চন্দ্র কি দেখিল? যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত রত্ন তাহার পর্ণকুটিরের দুয়ারে ধূলিমাখা-চরণে দাঁড়াইয়া! চন্দ্র তাঁহাকে চিনিল না। কেহই তাঁহাকে চিনে না, দীন হীন চন্দ্র চিনিবে কেমন করিয়া? সুস্নিগ্ধ রূপখানির ছটা চন্দ্রকে মুগ্ধ করিল।

চন্দ্র নিরক্ষর। তবু, তাহার অন্তরের মধ্যে কে যেন সে অক্ষর পুরুষকে চিনি চিনি করিতে লাগিল।

"চন্দ্র, আমাকে মুণ্ডন করিয়া দাও"

চন্দ্রের কাণে এই স্নেহমাখা আদর বাক্য পৌঁছিল। চন্দ্রের দ্বিরুক্তি করিবার অবস্থা নাই। যন্ত্র চালিতের মত সে ক্ষৌর-কার্য্যের যন্ত্রপাতি লইয়া বসিল।

কলিকাতায় বকুলালের কাছে যে কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদামের চিত্র রাখিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহার অন্তর্দ্ধান হইবে। চন্দ্রের হাত কাঁপিতেছে। বুক দুরু দুরু করিতেছে। নবকৈশোরের নূতন উন্মেষে বন্ধুর সুকুমার দেহে রূপলাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে। কি দিব্য অঙ্গগন্ধ! বিমুগ্ধ চন্দ্র সে চরণ চন্দ্রের চন্দ্রিকা-উদ্ভাসিত ধূলি তুলিয়া মাথায় লইল। তাহার সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন একটা তড়িত শক্তির ক্রিয়া চলিতে লাগিল। চন্দ্রের চক্ষু জলপূর্ণ। দেহ কণ্টকিত।

চন্দ্রের ভাগ্যের সীমা নাই। জানেনা সে, তবু ভাগ্য ভাগ্যই। জানেনা সে, আজ শুদ্ধ গঙ্গাজলে কাহার মস্তক সিক্ত করিল, কাহার কুঞ্চিত কেশপাশ তীক্ষ্ণক্ষুরের ধারে সে অপসারিত করিল! কাহার চম্পক-কলি অঙ্গুলি হইতে শেফালী পাপড়ির মত নখ-গুলির অগ্রভাগ সে তীক্ষ্ণ নখকৃন্তনের দ্বারা কর্ত্তন করিল। কার্য্যশেষ করিয়া চন্দ্র সেই মুণ্ডিত মস্তকটির দিকে একবার চাহিল। সে দেখিল একটি অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ গোলক। ছটায় তাহার চন্দ্রসূর্য্য ম্লান হইয়া যায়। এই মুণ্ডিত শ্রীমস্তকটি আমরা আরও দুইদিন দেখিবার ভাগ্য পাইয়াছি। চন্দ্র কিন্তু আর দেখে নাই।

তখন বালক বয়স। প্রাণপ্রেষ্ঠ পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ বাসরে মুণ্ডিতমস্তক বালকবন্ধুকে দেখিয়াছি, এক আসনে আটঘণ্টা

বসিয়া সুস্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। তারপর পৌগণ্ডে আর একদিন দেখিয়াছি, নব উপবীতধারী কাষায় বস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক নবীন ব্রহ্মচারিরূপে বন্ধুসুন্দর দণ্ড কমুণ্ডলুহস্তে ভিক্ষা করিতেছেন। আজ তৃতীয় বার কৈশোরে এই নব মস্তকমুণ্ডন। আজ কেহই জানে না, কি উদ্দেশ্যে শ্রীকেশের এই অন্তর্দ্ধান হইল।

ক্ষৌরকার্য্য শেষ করিয়াই চন্দ্র দেখিল তাহার পার্শ্বে একটি চক্‌চকে রৌপ্যখণ্ড। সেইটি তুলিতে গিয়া চন্দ্র একটু অন্যমনস্ক হইল। অমনি চক্ষু ফিরাইতে চন্দ্র দেখিল বিদ্যুল্লতার মত সে পুরুষবর চলিয়া গেলেন। চন্দ্র সুপ্তোত্থিতের মত চারি দিকে চাহিল। কই, সে কোথায় গেল। হায় হায় কি করিলাম! ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। চন্দ্র আর্ত্তের মত ঘরের বাহির হইল। বাড়ীর পার্শ্বে প্রতিবেশী মণি সরকারকে দেখিয়াই সে বলিল, 'ভাই কোন্ দিকে গেলেন দেখিয়াছ?' মণি সরকার বলিলেন 'কাহাকে'—চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চন্দ্র বলিল, 'সেই তাঁহাকে'। মণি পুনরায় বলিল, 'কাহাকে?' অধীর চন্দ্র—'সেই সুন্দর'…। চন্দ্র আর বলিতে পারিল না। সে ছুটিল গঙ্গার দিকে—ছুটিতেছে আর ভাবিতেছে 'হায় হায়, কেন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম না।'

যাঁহার পরিচয় কেহই পায় না আজ চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেই বা তাঁহার কতটুকু পরিচয় পাইত। চেনা যাঁহাকে সর্ব্বতোভাবেই উচিত, চন্দ্র তাঁহাকে একটুকুও চিনে নাই। কিন্তু না চিনিলে কি হইবে! দর্শন স্পর্শনের পরম ফল যে

অনাবিল আনন্দ, চন্দ্র তাহা পাইয়া ভরপূর হইয়াছে। চক্ষের সহিত সর্ব্বদেহ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বিস্ময়, আনন্দ ও দৈন্য-মাখা চন্দ্রের কথায় মণি সরকারও ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। সে অ-ধরকে ধরিতে।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

অবগাহন মাধুরী

চন্দ্রশীলকে কৃপা করিয়া মুণ্ডিত মস্তক বন্ধুচন্দ্র পতিত পাবনী সুরধুনীর পূতনীরে অবগাহন করিতেছেন। কণ্ঠমগ্ন জলে দাঁড়াইয়া স্নানরত বন্ধুসুন্দর গুণ্ গুণ্ করিয়া গান করিতেছেন। মনে হয়, একটি শুভ্র শতদল জলের উপর ভাসিতেছে। ধবল-তরঙ্গমালা মৃদু পবনান্দোলনে সে বর অঙ্গ চুম্বন করিতেছে। অবগাহনের মাধুর্য্য দর্শন করিলে বন্ধুসুন্দরের অপ্রাকৃত রচনা মধ্যে শ্রীগৌরচন্দ্রের উষাবগাহন লীলার দৃশ্যপট অন্তশ্চক্ষুর অগ্রে ফুটিয়া উঠে। পদে পদকর্ত্তার আত্মাস্বাদনই বটে—

গঙ্গানীরে গৌরচন্দ্রের উষাবগাহন।
কল্লোলিনী মালিনী করে আবাহন॥
(দুই কর যুড়ে রে)
ধবলিম বীচিমালা ধোয়ায় চরণ।
(সুখের সীমা নাই মা)

উদ্বেলিত তরঙ্গে বন্দে হৃষ্ট মন।
(প্রাণ নাথে পেয়ে মা)
মহোল্লাসে প্রেমে বাসে সেবন পূজন।
(কত সাধ ছিল মা)
হ্রীজিত দুর্ম্মুখ বন্ধু তামস তপন।
(দূর হওরে তুই)

ভাবে ঢল ঢল ভাবের ঠাকুর সুরধুনী তরঙ্গে ভাসিতেছেন। বিরহকাতরা ভাগীরথীও দীর্ঘকাল পরে "প্রাণনাথে পেয়ে" মহাপ্রেমে উদ্বেলিত তরঙ্গে মহোল্লাসে বন্দনা করিতেছেন। তীরে দাঁড়াইয়া বহু নরনারী সে জলশায়ীর জলখেলা দর্শন করিতেছেন। সবাই ভাবিতেছেন "ইনি কে ? এমন সোনার মানুষ কোথা হ'তে এ'ল ?"

অবগাহনান্তে বন্ধু সুন্দর তীরে উঠিয়া শুষ্ক বসন পরিধান করিলেন। তখন তাঁহার তপ্তোজ্জ্বল স্নিগ্ধ স্বর্ণদ্যুতি সকলেরই নয়নের সফলতা বিধান করিতে লাগিল। তাঁহারা সেই রূপের তুলনা খুঁজিতে বৈষ্ণব কবির অমর ভাষার আশ্রয় লইলেন,

"সুবরণ বরণ হেরি নিজ কু-বরণ
মানি আওন মনস্তাপে।
নিজতনু জারি ভসম সম করইতে
পৈঠল অনল সন্তাপে।"

মাতৃ মিলন

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সম্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥

শ্রীশুক

স্নানান্তে ঝটিতি সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সে গূঢ় কপট মানুষ দ্রুত গতিতে পুনরায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিল্ব বৃক্ষমূলে উপনীত হইলেন। ঐসময় নানাজন নানাকথা বলাবলি করিতে লাগিল। ভক্তেরা বলিলেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রাধাগোবিন্দ সেবার মাহাত্ম্য এখনও আছে। এখনও দূর দূরান্তর হইতে সাধক ভক্ত আসিয়া এই দেবস্থানে প্রণাম বন্দনা করেন। বৃদ্ধেরা বলিলেন, যুবকের আকৃতির সহিত ন্যায়রত্নের মুখের সাদৃশ্য আছে। বৃদ্ধারা বলিলেন, পণ্ডিত ঘরণী বামাদেবীর গায়ের সোনালী বর্ণ এ যুবকের অঙ্গে ঝলক দিতেছে।

মুখে মুখে কথাটা প্রচার হইয়া গেল। ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীর অন্দরেও সংবাদটি পৌঁছিল। ন'মা দেবী ক্ষমাময়ী কথাটা শুনিয়াই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। জগৎ সুন্দর তখন পিতৃমাতৃ চরণ স্মরণে আবির্ভাব পীঠে প্রণাম করিতেছেন। ন'মা—"বাবা বাবা" বলিয়া তখনই বাহিরে আসিলেন। ন'মাকে দেখিয়াই জগৎসুন্দর প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে গেলেন। ন'মা তিন পা পিছনে সরিয়া গেলেন। স্নেহ ও ভক্তি এই দুইয়ের বিরুদ্ধ তরঙ্গাভিঘাতে ন'মার মুখে অপূর্ব্ব শোভা ফুটিল। পরম

কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধু সুন্দর ন'মার মুখের দিকে চাহিলেন। মা কেবল "বাবা বাবা" বলিয়া কাঁদিতেছেন। তাহারই মধ্যে দাস্য বাৎসল্যের অপূর্ব্ব মিলন মধুরিমা মূর্ত্তি ধরিয়াছে। বন্ধু-সুন্দর সেই রস শাবল্য আস্বাদন করিতেছেন আর ভাবিতেছেন —এ ভাবের বিনিময়ে দিবার কি আছে?

একবার মাত্র কারাকক্ষে দর্শন, তারপর একাদশ বৎসর পরে কংস বধান্তে দ্বিতীয় বার দেখা। তখন মা দেবকীর চিত্তের যে অবস্থা, আজ ন'মার যেন সেই অবস্থা। জন্মাবধি দেড় বৎসর কত আদরে বুকে তুলিয়া লালন পালন করিয়াছেন। মাতৃবিয়োগের পর তিনমাস এক মূহুর্ত্তকাল কোল ছাড়া করেন নাই। ন'মার হৃদয়খানি বাৎসল্য স্নেহের সাগর। আজ ষোড়শ বৎসর পর স্নেহধনকে পাইয়া মাসান্তে চন্দ্র-দর্শনক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত, সে স্নেহের বারিধি উদ্বেলিত। অন্যদিকে, জগদ্বন্ধু সুন্দরের রূপমাধুর্য্য ভাব গাম্ভীর্য্য ও জ্যোতির ঝলক দেখিয়া পরম উন্নত-সত্তা মহাপুরুষ-বোধ সকলের হৃদয়েই জাগে, ন'মারও তাহাই জাগিয়াছে।

দেবী কিরীটেশ্বরীর ওখানকার এক সন্ন্যাসী যে ঐ চরণ তলে চিহ্ন দেখাইয়া "এ ছেলে রাজা হবে" ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, সে কথা ন'মার কানে এখনও লাগিয়া আছে। ন'মার হৃদয় ভক্তিরসে গদগদ হইয়াছে। ভক্তি চায় আশীর্ব্বাদ লইতে। স্নেহ চায় আশীর্ব্বাদ করিতে। দুইই যুগপৎ সমভাবে প্রকটিত হইয়াছে। প্রণাম করিবারও উপায় নাই—লইবারও উপায় নাই। ন'মা, তাই কেবল "বাবা বাবা" বলিয়া কাঁদিতেছেন। "বাবা"

ডাকের মধ্যে একই সময় স্নেহ ও গৌরব প্রকাশ লাভ করিতেছে। নয়নে গলিত অশ্রুধারার মধ্যেও ভক্তিগঙ্গা ও স্নেহ যমুনা মিলিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ন'মার মুখখানি যেন প্রয়াগ সঙ্গম। সে সঙ্গমে অবগাহন করিয়া বন্ধু কিশোর মস্তক মুণ্ডনের সার্থকতা অনুভব করিতেছেন। উভয়ে অপলকে চাহিয়া আছেন। বন্ধুর দৃষ্টিখানি তেরছ। মায়ের চাহনী সরল। বর্ণনায় সরস্বতী স্তব্ধীভূতা। গোলোকীয় প্রেম সুষমার এই জীবন্ত মূর্ত্তির দর্শক ভাগ্যবান ধামবাসীজন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" যে আমাকে যেমন করিয়া ভজনা করে তাঁহাকে সেই ভাবেই ভজনা করি ; গীতায় কুন্তীপুত্রের নিকট যাঁহার এই প্রতিজ্ঞা বাক্য, তিনি বুঝিবা ভাবিয়া আকুল, "এ ভজনের প্রতিরূপ ভজনে আমার কি শক্তি আছে।"

কতক্ষণ সময় যে কাটিল কে বলিবে। অথবা ষোড়শ বর্ষান্তে এই অপূর্ব্ব মাতৃমিলন দৃশ্য দর্শন করিতে কালের গতি স্তব্ধ হইল, তাহাই বা কে বলিবে। লীলাশক্তির প্রেরণায় বন্ধুসুন্দর নিজকণ্ঠ হইতে রুদ্রাক্ষের মালাটি ধীরে ধীরে খুলিলেন। শ্রীকরে মালাটি লইয়া তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টি করিলেন। এই সেই মালা, যে মালা-উপচারে পাবনার শিবভক্ত দম্পতি তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন। এই সেই মালা, যে মালা কম্বুকণ্ঠে ধারণ করিয়া, প্রিয় বকুলালকে বামভাগে রাখিয়া আপনার নিরুপম আলোকচিত্র জগজ্জীবকে দান করিয়াছেন। সেখানে মালাটির তিনটি স্তবকে যেন ভক্তি স্নেহ কারুণ্য মাখামাখি হইয়া আছে। শ্রীকরে লইয়া পূতদৃষ্টি দ্বারা রসপুটিত করিয়া জগজ্জীবন

তাহা ন'মার করে অর্পণ করিলেন। বাগ্দেবী নীরব। শ্রীহস্তের ভঙ্গিটী যেন ভাষা পাইয়া বলিল, "ন'মা, এ মালার সঙ্গে আমিও তোমার হইয়া রহিলাম।"

কর্পূর-শুভ্র বস্ত্রাঞ্চলে মুক্তাবিন্দুর মত নয়নাশ্রু মুছিয়া কম্পিত করে দেবী ক্ষমাময়ী মালাটি ধারণ করিলেন। হস্তে লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া অমনি গলায় দোলাইলেন। সন্তানের ভক্তি আর মহাপুরুষের আশীষ দুইয়ের মিলিত মূর্ত্তিস্বরূপ মালা, ন'মার গলে দুলিল। কত শোকসন্তাপ, আর্ত্তি, বিষাদ, প্রীতি, বাৎসল্যপূর্ণ কল্যাণময়ী ন'মার বক্ষোপরি মলয়জ শীতল মালা দুলিল। 'ন'মা, তুমি ধন্য! ভগবানের কণ্ঠ হইতে ভক্তের কণ্ঠে উঠিয়া মালার গর্ব্ব বাড়িল—মালা, তুমি ধন্য! আবার, চিত্রে বন্ধুর কণ্ঠে তোমায় নিত্য দেখিয়া আমরাও ধন্য! তোমায় দেখিয়া আমরা লাহিড়ী গৃহে শিবরূপ, বকুর পার্শ্বে আচার্য্যরূপ, ও স্নেহময়ীর অগ্রে সন্তান রূপ, এই তিনরসের দেবপ্রয়াগে তীর্থ স্নান করি।

অজানা পথে

অতঃপর দুই বৎসর—বার শত পঁচানব্বই সালের শেষভাগ হইতে সাতানব্বই সালের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত—বন্ধুসুন্দর যে কোথায় ছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ কাহারও জানা নাই। কোন্ কোন্ অজানার পথে যে সে অজানা পুরুষ আপনা ঢাকা দিয়া বিচরণ করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। পরবর্ত্তিকালে কখনও কখনও কথা প্রসঙ্গে যে দু'চার কথা বলিতেন, তাহা হইতে কিছু কিছু অনুমান করা যায়। অনুমান হয়, এই দুই বৎসর তিনি নানা দেশ বিদেশে পুণ্যতীর্থ পাহাড় পর্ব্বত নদনদী পর্য্যটন করিয়া জগজ্জীবের অবস্থা ও গ্রামনগরী পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

কোনও সময় নিতাই ভাবাবিষ্ট "পাগল" শ্রীহরনাথ ঠাকুর এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া কোনও ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু জগদ্বন্ধুর সঙ্গে রাজপুতনায় হ্রদের তীরে সাক্ষাৎ হইয়াছে।" কোনও সময় ইংলিসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় চম্পটী ঠাকুরের হস্তে প্রভুবন্ধুর শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এই বালককে প্যারিসে এক বিরাট সভাস্থলে আমি দেখিয়াছিলাম। ইহার কথায় ও রূপের আকর্ষণে আমরা অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই ফটো যে তাঁহারই ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" লণ্ডনের কোন একটি বিশিষ্ট প্রাসাদের অবিকল বর্ণনা করিয়া সেখানে তাঁহার সঙ্গে যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎ

হইয়াছে এইরূপ কথা প্রভু বন্ধু নিজেই কোনও কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন।

এই প্রকারের আরও বহু ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা হইতে অনুমান করা যায় যে, এই সময় প্রভুবন্ধু ভারত ও ভারতের বাহিরে বহুস্থানে গমন করিয়াছিলেন। জগদ্বন্ধু যাঁহার নাম, জগৎ জুড়িয়াই তাঁহার লীলা ও কার্য্য। তিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন ইহাতো স্বাভাবিকই। যিনি ভক্ত হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া তাহাকে পরম তীর্থ তুল্য করেন, তাঁহার পাদস্পর্শে আজ কত জনপদ পবিত্র হইল। কত সাধু সজ্জন সে সাধনের ধন সন্দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইল। কত ধনী মানী রাজা মহারাজা তাঁহার করুণার বাতাসে জীবনের সার্থকতা অনুভব করিল। কত দীনহীন কাঙাল পতিত পতিতপাবনের স্নেহের স্পর্শে শান্তিময় রাজ্যের সন্ধান জানিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ তিনি দিলেন না।

ব্রজ অভিমুখে

সকল তীর্থসলিলে অবগাহন করিয়া, সকল পবিত্ররজেঃ অবলুণ্ঠন করিয়া প্রভু বন্ধুসুন্দর লালসাপূর্ণ কণ্ঠে আবেগভরে আপনমনে গাহিয়া চলিয়াছেন,—

কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবন রে।
গোপীপদরজঃশিরে করিব ধারণ রে॥
সখীসনে অভিসারে করিব গমন রে।
কবে আমি হেরিব সে যুগলমিলন রে॥
কবে দোঁহে কাঁচলীতে করিব ব্যজন রে।
কবে দোঁহে নিরখিয়ে জুড়াব জীবন রে॥
কবে দোঁহে প্রদক্ষিয়ে গাব নাম সংকীর্ত্তন রে॥
কবে, জগবন্ধুর শিরে রাই দিবেন শ্রীচরণ রে॥
কবে, রাধাকৃষ্ণে সমর্পিব দেহ প্রাণ মন রে।

যেখানে যাইতেছেন, যাহাকে দেখিতেছেন অন্তরের অন্তস্তলে একমাত্র এই জিজ্ঞাসাই—কবে ব্রজে যাইব। কবে গোপীপদরজঃ মাথায় লইব। কবে সখীসঙ্গে অভিসারে গিয়া যুগল মিলন দর্শন করিব। কবে যুগলকিশোরের মোহন মাধুরী দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইব, ব্যজন সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব। কবে প্রাণেশ্বরী ভানুদুলালী আমার মাথায় শ্রীচরণ দিয়া কৃপাকর্ষণে কুঞ্জে লইয়া যাইবেন। আমি যুগলচরণে দেহমনপ্রাণ যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিয়া অনন্তকালের জন্য তাঁহাদের হইয়া যাইব।

মঞ্জরী ভাবাবেশে স্বলীলা মাধুরী আস্বাদনপর শ্রীশ্রীবন্ধু-

সুন্দর এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতেই আজ দেশবিদেশ ও তীর্থভূমি দর্শন করিতেছেন। এই পর্য্যটনটি যেন তাঁহার ব্রজে পৌঁছিবারই রাস্তায় চলা। সকল তীর্থই যেন ব্রজের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার সোপান। সকল পূত সলিলে অবগাহনই যেন প্রেম যমুনা। গোপীপদরজঃ লাভেই যেন সকল তীর্থস্নান ও মহদনুগ্রহ লাভের সার্থকতা। তাই সকল রাস্তা ঘাট ঘুরিয়া সকল নদনদী পার হইয়া সকল বনবীথি অতিক্রম করিয়া, সকল সোপান উত্তীর্ণ হইয়া প্রচ্ছন্ন অবতারী আজ একাকী ব্রজে চলিয়াছেন।

প্রভু বন্ধুর দেশ পর্য্যটনের এই দুইটি দিক। একদিকে স্বকীয় পদরজ স্পর্শে সবদেশ পবিত্রীকরণ। আর এক দিকে লোকশিক্ষা, কারণ—"ঠাকুর বৈষ্ণবগণের" পদরজঃ কুড়াইয়া ব্রজের পাথেয় সংগ্রহ। তাঁহারই অমিয় ভাষায়,

"ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করিবেন আলিঙ্গন
জড় হেন পড়িব চরণে।
কৃপা আজ্ঞা ধরিশিরে, ভাসিব নয়ন নীরে
দাসহ'ব দেহমনপ্রাণে॥"

একাধারে ভক্ত ও ভগদ্ভাবের অখণ্ড মিলনময় বিগ্রহ ব্রজজীবন শ্রীবন্ধুসুন্দর আজ যেন বিশ্বের সকলের কৃপাপাথেয় লইয়া ব্রজমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, নয়নজলে বক্ষ ভাসিতেছে। অন্তরের অন্তর গুমরিয়া গাহিতেছে,—

মাতি হরে কৃষ্ণ নামে, কবে যাব ব্রজধামে,
প্রবেশ করিব মধুপুরে।

(ব্রজে কি যাব আ) (হরে কৃষ্ণ মালা ল'য়ে)
নেহারি' শ্রীবৃন্দাবন, শিহরিবে সংহনন,
সাষ্টাঙ্গে পড়িব কতদূরে।
(পড়েই রব মা) (আর উঠিরও না)

জয়পুরে শ্রীশ্রীগোবিন্দবিগ্রহ

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলে প্রবেশের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শ্রীশ্রীগোবিন্দজী দর্শন মানসে জয়পুর উপস্থিত হন। ব্রজ-ধামেশ্বর শ্রীগোবিন্দজী জয়পুরেই বিরাজমান আছেন। ইনি শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রাণের ঠাকুর।

প্রাচীন ঐতিহ্য এই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভের ঐকান্তিক আগ্রহে শিল্পী স্বয়ং বিশ্বকর্মা ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা এই বিগ্রহ নির্ম্মাণ করেন। এই বিগ্রহ দর্শন করিয়া বজ্রনাভের পিতামহী প্রদ্যুম্ন ঘরণী রতিদেবী বলিয়াছিলেন যে বিগ্রহের শ্রীবদন অবিকল শ্রীকৃষ্ণের মত হইয়াছে। বহু ঐতিহাসিক কারণ বশতঃ ভগবদিচ্ছায় একসময় ব্রজমণ্ডল অরণ্যসমাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীগোবিন্দজী তখন ঐ বনমধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। পরে শ্রীগৌরহরির কৃপাশক্তিতে শক্তিমান শ্রীগোস্বামিপাদগণ ব্রজে বাস করিয়া যখন লীলাধাম উজ্জ্বল করেন তখন স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। অন্যূন আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে বিধর্ম্মী

অত্যাচারীর ভয়ে তৎকালীন জয়পুরাধিপ কর্ত্তৃক গোবিন্দজী জয়পুরে আনীত হন। তদবধি জয়পুরেই রাজবিগ্রহরূপে পরনাদরে পূজিত হইতেছেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বাহ্নে বন্ধুহরি শ্রীগোবিন্দের বদনচন্দ্র দর্শনমানসে জয়পুর উপনীত হইলেন। প্রায় দুই বৎসর অজ্ঞাতবাসের পরে বারশত সাতানব্বই সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বন্ধুহরি জয়পুরে আত্মপ্রকাশ করেন, এসংবাদ সঠিকভাবেই পাওয়া যায়।

"শ্রীমদ্ রাধা শ্রীলগোবিদেবৌ
প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি"

ভক্তভাবে মহাপ্রেমে বন্ধুসুন্দর শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রূপের ছটায় চারিদিক আলোকিত হইয়া গেল। এই অপূর্ব্ব দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে পূজারীগণ সংকুচিত। সমবেত দর্শকগণ দুইপার্শ্বে দাঁড়াইল। বন্ধুসুন্দর নির্নিমিষ নয়নে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্রীগোবিন্দজীর মুখারবিন্দ হইতেও অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। স্বভাবসুন্দর গোবিন্দ আরও সুন্দর হইয়া উঠিলেন। উপস্থিত ভাগ্যবান দর্শকগণের সকলেরই মনে হইতে লাগিল যে দুইটি রসের বিগ্রহ যেন পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করিতেছেন।

বন্ধুসুন্দরের অঙ্গে কদম্ব কোরকের মত পুলক দেখা দিল। শ্রীগোবিন্দজীর কণ্ঠ হইতে শুভ্রধবল মালতীর মালাটি খসিয়া পড়িল। তখন ভোগ লাগিবে। দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

বন্ধুর স্থির দৃষ্টি নমিত হইল। প্রসাদী মালাটি লইয়া পূজারী আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইল। বন্ধুসুন্দর মস্তক অবনত করিলে পূজারী সভয়ে তাঁহার শোভনকণ্ঠে দোলাইয়া দিল। মালার স্পর্শে বন্ধুসুন্দরের সুবর্ণবর্ণ আরক্তিম হইয়া উঠিল। রুদ্ধ দুয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধীরে স্বানুভবানন্দে কহিতে লাগিলেন,—

জয় জয় গিরিধারী।
জয় শ্রীগোবিন্দ গোকুল আনন্দ।
গোপেন্দ্রনন্দন গোষ্ঠবিহারী।
চরণে নূপুর নখে নিশাকর,
চাঁচর চিকুরে চূড়া মনোহর,
চমকে চন্দ্রকে চপলা নিকর
কিবা রদ চারু মুকুতাসারি।
নীলকুবলয় বয়ান নয়ন,
নীরদ নবীন জিনি সংহনন
ভুরুযুগ কুসুমেষু শরাসন।
কটাক্ষে কাতর পুরুষ নারী।
গতিমত্ত করী গলে বন মাল,
নাভি সুগভীর শ্রীকরমৃণাল
কটি কক্ষ বক্ষ ভাল সুবিশাল
কালীয় কুণ্ডলী দমনকারী।
কিবা পীত ধড়া পাণি নিরমল
নাসা তিলফুল কপোল কোমল
শ্রবণে কনক মকর কুণ্ডল।
মঞ্জু-কুঞ্জ বন পুলিন চারী।

বিনোদ মধুর মুরলী অধরে,
রাধা নামসুধা বরষণ করে,
গোপিকাপ্রণয় সাগরে সন্তরে
জগতমানস তামসহারী।

ভোগান্তে আবার দর্শন হইল। বন্ধুসুন্দর স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া আছেন, আর উচ্ছলিত নয়ন সিন্ধুর জলে ভিজিয়া যাইতেছেন। ভোগারতির সময় ভোগদর্শন ও প্রণাম করিতে আসিয়া জয়পুর-রাজ সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ও গভীর ভাবাবেশ দর্শনে বিহ্বল হইয়া চরণে প্রণত হইলেন। তাঁহার দৈন্য-মাখা অনুনয়ে দয়াল প্রভু তাঁহার ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। একটি পৃথক গৃহ ধূপধূনা দ্বারা সংস্কৃত হইল ও তুলসীটব দ্বারা সুসজ্জিত হইল। বন্ধুহরি সেখানে আসন গ্রহণ করিলেন। রজনী মুখে শ্রীবন্ধুসুন্দর রাজাকে শ্রীশ্রীযুগল কিশোরের ভজন বিষয়ক কতিপয় দুর্লভ উপদেশ দিয়া কৃত-কৃতার্থ করিলেন। পর দিবস শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিয়া বন্ধু-হরি জয়পুর হইতে কাহাকেও না বলিয়া পলায়ন করিলেন। ভয়, পাছে বহুলোক সংঘট্ট হয় ও নির্জ্জনতার বিঘ্ন ঘটে।

শ্রীবৃন্দাবনে

কৃপা পাব ব্রজে যাব অমনি পশিব শ্রীবৃন্দাবনে।
কুঞ্জে মেগে খাব গুণ গাব বেড়াইব বনে বনে॥

—শ্রীবন্ধু

প্রেমবিহ্বল প্রাণ সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাবে বিভাবিততনু কৃষ্ণ-রসে রসিত জীবন শ্রীবামানন্দন বন্ধুধন পরম ব্যাকুল ভাবে শ্রীবৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিয়া ধূলায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষ পাতিব তাহায়
(বুক পেতে যে দিবরে) (প্রাণকান্তের পদচিহ্নে)

—শ্রীবন্ধু

পথে ধূলার মাঝে প্রাণকান্তের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া তাহাতে বুক পাতিয়া দিতে দিতে সাক্ষাৎ নিতাই-স্বরূপে বন্ধুবিনোদ ব্রজে প্রবেশ করিলেন। নিজরসমাধুরী আস্বাদন করিতে অই নিত্যানন্দ ভাবস্বরূপই গরীয়ান্।

হা গৌরাঙ্গ ব'লে কবে কুতূহলে
ভ্রমিব দ্বাদশ বন।
বৃষভানুপুর, যাবট মধুর
নন্দ গ্রাম সুদর্শন।

—শ্রীবন্ধু

হা গৌর প্রাণ গৌর বলিতে বলিতে প্রভু বন্ধু দ্বাদশবন পরিক্রমণ করিলেন। বৃষভানুপুর নন্দগ্রাম মধুর যাবট দর্শন করিলেন। ব্রজবাসীর "কুঞ্জে কুঞ্জে করপুটে মুঞ্জ মাধুকরী" ভিক্ষা মাগিলেন। শীতল যমুনা বারি "ঢর ঢর পান" করিয়া "আবাহন নিবেদন শ্রবণ মঙ্গলে" রত হইলেন। "সদারজঃস্নাত তনু" হইয়া

"তরুতলে বাস" করিয়া "অনাসক্তি শুদ্ধাভক্তি" সুনির্ম্মল ব্রজ-ভাবের আদর্শ প্রকটন করিয়া প্রচ্ছন্নাবতারী বন্ধুসুন্দর নিত্যানন্দ ভাবস্বরূপে চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমণ করিলেন। প্রভুবন্ধু ব্রজ দর্শন করিলেন। ব্রজভূমিও প্রভু-বন্ধুকে দর্শন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম তাঁহাকে আত্মবন্ধুর ন্যায় দর্শন করিলেন। শিখিগণ তাঁহাকে দেখিয়া পুচ্ছ প্রসারণ সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। কোকিলাদি বিহঙ্গকুল কলধ্বনি করিতে লাগিল। তরুলতা সকল পুষ্প-বর্ষণ করিল। পথে ধেনুগণ চরিতেছিল। তাহারা প্রভুকে দর্শন করিয়া নিকটে আসিয়া শ্রীঅঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। বন্ধুসুন্দর ধেনু সকল দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। একটু স্থির হইয়া উহাদের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ধেনুগণ বন্ধুসুন্দরের সঙ্গ ত্যাগে অনিচ্ছুক হওয়ায় রাখালগণ অতিকষ্টে তাহাদিগকে বন্ধুসুন্দরের অনুসরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইল। রাখালগণকে বিব্রত ও শ্রান্ত ক্লান্ত দেখিয়া বন্ধুসুন্দরের হৃদয়-সমুদ্রে এক নবভাবের উদ্দীপনা আসিল। প্রেমোন্মাদনায় গাহিতে লাগিলেন,—

একবার রাধা রাধা রাধা বলে নাচরে রাখালগণ।
ভাইরে, গোচারণ শ্রম যাবেরে শীতল হবে প্রাণমন॥
(ভাইরে, রাধা রাধা রাধা বলে')
ভাইরে, পিতা নন্দ গোপের ভূপাল
তবে যে সেজেছি আমি গোধন রাখাল
পেয়ে রাধাপদ কোকনদরে জুড়াব তাপিত জীবন।

ভাইরে, ত্যাজয়াছি গোলোক আসন,
রাধা মন্ত্র জপ তপ হৃদয় ভূষণ
যদি চাহ শ্যামে রাধানামের রাখ রুচি অনুক্ষণ।
(জয় রাধা নামে) (মোরে ধন্য কর)
মোরে দন্তে তৃণ ধরা যেরে ভাই
নিয়েছেন দাসখত কমলিনী রাই
আমি কায়মনে সে চরণে রে করেছি সব সমর্পণ।
(জয় রাধা পদে) (হেরি বন্ধু হাসে)
(সাক্ষী অষ্টসখী)

রাখালগণ সবভুলিয়া হাতে তালি দিয়া রাধে রাধে বলিতে লাগিল। ঢুলিতে ঢুলিতে প্রেমের ঠাকুর কুসুম সরোবরের একটি গোফার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদিন একাকী রহিলেন। পরে শ্রীকুণ্ডাভিমুখে চলিলেন।

কুণ্ডে কুণ্ডে স্নান করি সমাধান
আসিব রাস মণ্ডলে।
নয়নে নেহারি দুবাহু পসারি
লুটাব হা রাধে ব'লে।

শ্রীললিতা কুণ্ডে শ্যামকুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে দাঁড়াইলেন। শ্রীকুণ্ড দর্শন করিয়া বাহুপ্রসারণ করতঃ জড়বৎ পড়িয়া গেলেন। হা রাধে হা রাধে বলিয়া সুদীর্ঘ তপ্তনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। রোমকূপ হইতে রক্তোদ্গম হইতে লাগিল। কোন্ মহাভাবসিন্ধুর প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে এ হেন তীব্র বিরহ-তাপ কে বুঝিবে! কেই বা লিখিবে!

তখন রাজর্ষি বনমালী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজীর

কুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জনৈক ব্রজবাসীর মুখে বন্ধু-চন্দ্রের বৃন্দাবন আগমন সংবাদ অবগত হইয়া রাজর্ষি ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিলেন। হারানিধি দর্শন পাইবামাত্র সাষ্টাঙ্গে চরণতলে পতিত হইলেন। বন্ধুসুন্দরও পরমদৈন্য প্রকাশ করতঃ দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রাজর্ষি পড়িয়াই রহিলেন। বন্ধুসুন্দর ধীরে তাঁহাকে ধরিয়া মধুর স্বরে "উঠুন" বলিয়া উত্তোলন করিলেন। রাজর্ষি উঠিলেন। মুখে ভাষা নাই। তাঁহার নয়নে বিরহিনীর ভাষা—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে
দেখা না হইত পরাণ গেলে

রাজর্ষির সঙ্গে ব্রজে না আসিয়া বন্ধুসুন্দর একাকী আসিয়াছেন ইহাতে স্বীয় আচরণের মধ্য দিয়া পরম আদর্শ শিক্ষা প্রকটন করিলেন। সদা রজঃস্নাত তনু, তরুতলে বাস করতঃ মাধুকরী দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং সদা লীলা স্মরণে ডুবিয়া থাকাতেই যে ব্রজ দর্শনের সার্থকতা তাহা স্বয়ং আবরণ করিয়া জগজ্জীবকে বুঝাইলেন। রাজর্ষির সঙ্গে আসিলে রাজ সমাদরে থাকিয়া সাধ মিটাইয়া অতুল অমূল্য রজেঃ লুটাইবার ও মাধুকরী করিবার সুযোগে বঞ্চিত হইতেন। তাই মনের সাধে চৌরাশী ক্রোস মণ্ডল দর্শন করিয়া পরে আসিয়া রাজর্ষির কুঞ্জে ধরা দিলেন। রাজর্ষিও তাহা বুঝিলেন। রাজর্ষি মর্ম্মে মর্ম্মে জানিতেন, "প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।" রাজর্ষি, বন্ধু সুন্দরের শ্রীবদন কমল পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন বনওয়ারী নগরের সেই হাসিখুসিমাখা চারু মুখখানি আর নাই। বন্ধুর বদনচন্দ্র পরম

প্রশান্ত গম্ভীর সুগভীর ভাবসিন্ধু নিমগ্ন। তাহার নয়নে একটী প্রবল অনুসন্ধিৎসা যেন কাহারও তীব্র বিরহে কাতর হইয়া সেই হারানিধি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। রাজর্ষির নয়ন আছে, দেখিলেন একটি বিরহ রসের প্রতিমা। রাজর্ষির অনুভব আছে, বুঝিলেন ব্রজের বাতাসে এমন হইয়াছে।

শ্রীকুণ্ডতীরে

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা

পদ্মপুরান

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বসিয়া রাধাপ্রাণ শ্রীশ্রীজগবন্ধুসুন্দর দিবানিশি নয়ন নীরে ভাসেন। অনতিদূরে দাঁড়াইয়া গোস্বামী শ্রীরঘুনন্দন দর্শন করেন। কখনও কখনও রাজর্ষিরও দর্শনভাগ্য ঘটে। রাজর্ষি বাহাদুরের পত্র পাইয়াই গোস্বামিজী ব্রজে আসিয়াছেন। "জয় নিতাই" দেবেন্দ্রনাথ অনেক দিন পূর্ব্বেই নবদ্বীপ ফিরিয়া গিয়াছেন। গোস্বামিজী ব্রজে আসিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রভুবন্ধুর দর্শন পাইয়া অপার আনন্দ পয়োধিতে নিমজ্জিত আছেন। শ্রীরাধা কুণ্ডের তীরে তীরে বন্ধুগোবিন্দের যে নিবিড় ভাবাবেশ ও প্রেমবিহ্বলতার মূর্ত্তি প্রকটিত হয় তাহার সম্যক রসগাম্ভীর্য্য অনুধাবন করিবার শক্তি বালক রঘুনন্দনের নাই। শক্তি না থাকিলেও কৃপায় দর্শনের ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু নীলাচলে গম্ভীরার সেবকস্বরূপের মত সবখানি আস্বাদন করিতে বা করাইতে পারেন না।

আজ শ্রীকুণ্ডতীরে অবনত বদনে বসিয়া বন্ধুসুন্দর কাঁদিতে কাঁদিতে তপ্ত অশ্রুধারায় পরিস্নাত হইতেছেন। প্রেমবিহ্বল ঠাকুর ভাবাবেশে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছেন,

"হা রাধে হা প্রাণাধিকে প্রণয় পুতলি
বারেক কটাক্ষ কর করজোড়ে বলি"

মৃগনয়ন দুইটি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে করিতে "প্রণয় পুতলি"কে অনুসন্ধান করিতেছেন। যুক্তকরে একটিবার তাঁহার কারুণ্যময় কটাক্ষ ভিক্ষা করিতেছেন। "তৃষ্ণিত চাতক কণ্ঠে" কহিতেছেন,

"হা কিশোরী প্রাণেশ্বরী হৃদয় ধন।
দাসে বিতর দয়া দূরিতাকিঞ্চন।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অতিদূরে যেন কাহাকেও দর্শন করিতেছেন। কাহাকে যেন লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,

"জীবন যৌবন মন সপেছি চরণে।
তোমা বিনে নাহি জানি জীবনে মরণে।
(তুমিই গতি হে) (রাই কিশোরী মোর)

পুনঃ পুনঃ "তুমিই গতি হে, তুমিই গতি হে" বলিয়া সে প্রেমপূজায় আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিতেছেন। আবার কাহার দিকে যেন তেরছ দৃষ্টিতে চাহিতেছেন। কি যেন ভাবিয়া সোনার বাহুদুটি উর্দ্ধে তুলিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন,

"কৈ কৈ রাই আমার উদ্ধারণ মুক্ত হব।"

আবার পর মুহূর্ত্তে চারিদিকে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কোমল

নখের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমির উপর আচর কাটিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে বাষ্পকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,

"এই ভব কুহক রে
রাই তুমি উদ্ধারণ॥"

নিশীথিনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কুণ্ডযুগলের সঙ্গমস্থলে করুণ রাগীনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। "রাই তুমি উদ্ধারণ।" সে ধ্বনি কুণ্ডকোণের তরুণ তমাল তরুতে প্রহত হইয়া প্রতিধ্বনি তুলিল, "রাই তুমি উদ্ধারণ।" তারপর আবার সব নীরব। মহাযোগিনী যোগমায়া আপন সাম্রাজ্য দখল করিয়া লইয়াছেন। স্বয়ং যোগেশ্বরেশ্বর আজ যোগনিদ্রামগ্ন।

অই কে আসিতেছেন! রূপলাবণ্যের বিমল ছটায় কুণ্ড যুগলের তীর নীর উজ্জ্বল করিয়া অই কে দেখা দিতেছেন! প্রেমপূজার বিগ্রহটি বুঝি প্রত্যক্ষ প্রকটিত কণ্ঠমাধুর্য্যে ভারতীকে লজ্জা দিয়া প্রেমপূজারী বন্দনা গাহিতেছেন—

জয় জয় শ্রী রাধে।
জয় কমলিনী কুঞ্জ বিলাসিনী
প্রেমপাগলিনী মালীনী রাধে।
জয় জয় শ্রী রাধে।

জয় বিনোদিনী বিনোদ মোহিনী
বিন্দু নিবাসিনী বিপিন চারিনী
শ্যাম নামচারু চরণে শোভিনী
সতী শিরোমনি তরুণী রাধে।
জয় জয় শ্রী রাধে।

জয় হেমাঙ্গিণী কুরঙ্গনয়নী
প্রেম তরঙ্গিণী বন বিহারীণী
জয় নিতম্বিনী নিকুঞ্জ বাসিনী
শ্যাম সোহাগিনী তোষিণী রাধে।
জয় জয় শ্রীরাধে।

জয় আদরিনী আনন্দদায়িনী
আমোদ কারিনী মাধব ভামিনী
মধুর হাসিনী মধুর ভাষিনী
মরাল গামিনী মোহিনী রাধে।
জয় জয় শ্রীরাধে।

জয় গৌরবিনী গরিমা শালিনী
গোকুলবন্দিনী গোপাল কামিনী
জয় জয় সরদিন্দু নিভাননী
শ্যামাঙ্ক শায়িনী কামিনী রাধে।
জয় জয় শ্রীরাধে।

জয় রাজরাণী রাজার নন্দিনী
রক্ষ বন্ধু দাসে রাই সিমন্তনী
বাসব রঙ্গিনী গোপিকা সঙ্গিনী
গোবিন্দ রঞ্জিনী গোপিনী রাধে।
জয় জয় শ্রীরাধে॥

"জয় জয় শ্রীরাধে" "জয় জয় শ্রীরাধে" ধ্বনি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া নীরবতার প্রান্তে পৌঁছিল। বন্ধুসুন্দরের নয়নে অশ্রু-ধারা। বিরহ তপ্ত উদার উন্মুক্ত বক্ষে পড়িয়া সে অশ্রু শুষ্ক হইল। তখন সে শ্যামাঙ্কশায়িনী কামিনী কোমল করে

প্রাণবন্ধুর কণ্ঠ জড়াইয়া ধীরে ধীরে নয়ন ধারা মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "বঁধুয়া নাম বাতাও।" নাম উচ্চারিত হইল। সে রূপসী বালা নাম বলিয়া বলাইয়া প্রাণবঁধুয়ার বক্ষে লীন হইলেন। যোগ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। "রাধে জয় রাধে" আবেগভরা ধ্বনি কুঞ্জবনের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। প্রাণবন্ধু মহাপ্রেমে আবিষ্ট। চৈতন্য মন আজ অচৈতন্য।

একি স্বপ্ন? স্বপ্ন নহে। তুরীয় ভূমির উর্দ্ধে যে অপ্রাকৃত চিদানন্দ লীলাবারিধি ইহা তাহাতে মিলন বিরহময় প্রেম-বৈচিত্র্যের একটি বিচিত্রময় তরঙ্গ? অই যে সে-ই তরঙ্গাঘাতেই বন্ধুসুন্দর লিখিতেছেন,—

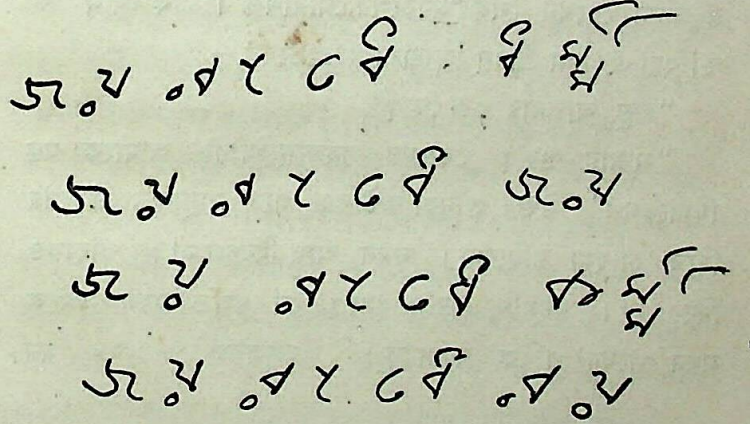

পর দিবস হইতে রঘুনন্দন দেখিতেছেন, বন্ধুসুন্দরের এক অপ্রাকৃত অভিনব রূপ। নবরসে নবভাবে মাখামাখি হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব প্রেমঘনপ্রতিমা মূর্ত্ত হইয়াছে। "রাধা" এই অক্ষর দুটি তাঁহার আর উচ্চারণ করিবার উপায় নাই।

শুনিবারও উপায় নাই। কেহ বলিল, রাধে রাধে—অমনি শ্রুতিগত হওয়ামাত্রই চকিতের মত দিশাহারা। কোন দিকে পলায়ন করিবেন খুঁজিয়া যেন পথ পাইতেছেন না। রাধা নাম বলার বা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুসুন্দরের সর্ব্বাঙ্গ সাত্ত্বিক ভাবের অতুলনীয় ভূষণে ভূষিত হইয়া উঠিতেছে। "রাধা কুণ্ড" শব্দটি পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিবার উপায় নাই। তাই বলিতেছেন "অমুক কুণ্ড" নিতান্ত প্রয়োজনে রাধা বিষয় বলিতে হইলে বলিতেছেন, "তোদের কিশোরী"

এ সব অপূর্ব্ব অনুভাব রাজর্ষিও দেখিলেন। বারংবার দেখিলেন। রাজর্ষির নয়ন ভরিয়া আসে, দেখা হয় না। রঘুনন্দন দেখেন সেই "নবরসের গোরাশশী।" কি জানি কি ভাবিয়া একদিন শ্রীরঘু জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"প্রভু, আপনার গুরু কে ?"

"আমার গুরু ? তোদের বৃষভানুকুমারী আমাকে মন্ত্র দিয়াছেন।" উত্তর শুনিয়া কণ্টকিত গাত্র রঘুনন্দন শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নয়ন আর ফিরিল না। কাহারও ফিরে না। রঘুমণি, তুমি ধন্য! সে দুর্লভ নয়ন মণিকে নয়ন পথের পথিক করিয়াছ! বন্ধুলীলা ১৮ ২০ মন

সরযূ নদী

ব্রজ হইতে প্রভু বন্ধুহরি বাংলা অভিমুখে ফিরিতেছেন। কি জানি কি ভাবিয়া আড়া ষ্টেসনে অবতরণ করিলেন। পরিচিতের মত পথ চলিয়া একটি বাসার দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন,-"হরে কৃষ্ণ।"

নামের সঙ্গে সুরের ঝঙ্কারটী বাতাসে ধ্বনিত হইল। চিরকালের জানা কণ্ঠের সাড়া পাইয়া একটি কুলবধূ অবগুণ্ঠণ টানিয়া গবাক্ষ উন্মোচন করিল। ছোট মামা! ছোটমামা! ক্ষীরোদার আনন্দের সীমা নাই। হৃদয় দুয়ার, বাহিরের দুয়ার সবই খুলিয়া গেল। বন্ধুসুন্দর ভিতরে গিয়া নিজ মৃগচর্ম্ম পাতিয়া উপবেশন করিলেন। ক্ষীরোদা প্রণাম করিলেন।

দিগম্বরী দেবীর কন্যা ক্ষীরোদা এখন স্বামীর সহিত আড়াতে বাস করিতেছেন। অতুলচন্দ্র আড়া হাইস্কুলের হেডমাষ্টার। আজ এই দূর প্রবাসে নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ভাবে পরম প্রিয় ছোটমামার শুভাগমনে অতুলচন্দ্র ও ক্ষীরোদাসুন্দরীর আনন্দ আর ধরে না! সে আনন্দ কিরূপ তাহা অন্যে দূরের কথা তাঁহারা নিজেরাও ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

ক্ষীরোদা সুন্দরীর দুইটি কন্যা রত্ন জন্মিয়াছিল। শ্রীবন্ধু সুন্দরেরই ইঙ্গিতে দিগম্বরী দেবী তাহাদের নাম রাখিয়াছিলেন সরযূ ও সরসী। তন্মধ্যে সরযূ বালা কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছে। শোকাকুলা ক্ষীরোদাসুন্দরী বন্ধুসুন্দরের

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিয়া বলিলেন, "ছোট মামা, সরযূ আমাদের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে।"

এ কথা শুনিয়াই বন্ধুহরি বলিলেন, "ক্ষীরোদা, তুই সরযূর জন্য দুঃখ করিস্ নে। সে ছিল শাপভ্রষ্টা। তোর গর্ভে বাস করিয়া শাপ মুক্ত হইয়া গিয়াছে। সে সরযূ নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমি যখন এবারে সরযূ নদীতে স্নান করতে গেলাম, তখন তোর সরযূ দুইটি ছোট হাত মে'লে আমার সম্মুখে দাঁড়া'ল, আমি তাকে আদর করলাম। সে জলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।"

ত্রিতাপহারী বন্ধু সুন্দরের স্নিগ্ধ মধুর প্রবোধ বাক্যে এবং তাঁহার শ্রীমুখে সরযূর স্বরূপ ও তৎসম্পর্কিত অভাবনীয় ঘটনা শুনিয়া ক্ষীরোদা সুন্দরীর শোকাবেগ যেন সম্পূর্ণ প্রশমিত হইল। তিনি ছোট মামাকে প্রাণ ভরিয়া সেবা যত্ন করিতে লাগিলেন। জগৎ সুন্দরের ঐশ্বর্য্যের ঝলক স্নেহময়ী ক্ষীরোদা-সুন্দরীর কাছে কিছুই নয়। অতুলচন্দ্র কিন্তু তাহার ফলে একটু সংকোচিত হইয়া পড়েন। বন্ধু সুন্দর দুই দিন আড়াতে যেন বাঁধা থাকিলেন। প্রেমের কাঙাল, নিখুঁত প্রেমের অটুট বন্ধনেই বাঁধা পড়েন।

নানা প্রকার মধুর কথায় রজনী কাটে। ছোটমামা এতদিন নিখোঁজ হইয়া কোথায় ছিল, তাহা শুনিতে ক্ষীরোদার অত্যন্ত আগ্রহ। বন্ধু নানা রঙ্গে নানা দেশের গল্প বলেন। ব্রজের ধূলি ক্ষীরোদার মস্তকে দিয়া বলেন, "রজঃরাণীর কৃপায় কৃষ্ণভক্তি হয়।" ক্ষীরোদা দেবী কত ভক্তি করিয়া সে রজঃ

গ্রহণ করেন। সরসীর মাথায় দেন। অতুলের হাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে মাথায় দিতে বলেন। অতুল প্রণাম করিয়া ব্রজের রজঃ গ্রহণ করেন। রজঃরাণী শিরে উঠিয়া কৃপার নয়ন মেলিয়া অতুলচন্দ্রের দিকে যেন সহাস্যে তাকান।

অতুলচন্দ্র বন্ধুসুন্দরের জন্য মটকার বস্ত্র ও উত্তরীয় কিনিয়া আনিয়াছেন। ক্ষীরোদা দেবী দিতে আসেন। বন্ধু সুন্দর বালকের মত হাত পাতিয়া তাহা গ্রহণ করেন। "ছোট মামা, এসব তোমাকে এখনই পরিতে হইবে।" ক্ষীরোদার এই প্রাণস্পর্শী আগ্রহ উপেক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াই বন্ধুসুন্দর সেই বস্ত্র নিয়া পরিধান করতঃ উত্তরীয় গায়ে দিলেন। উত্তরীয় খানার সঙ্গে অঙ্গের বর্ণ মিশিয়া গেল। নয়ন ভরিয়া সে শোভা দেখিয়া দেখিয়া ক্ষীরোদাদেবী আনন্দে ভাসিলেন। অপলক নেত্রে সে-রূপ দেখিয়া গম্ভীর অতুলচন্দ্র বহু চেষ্টায় আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। এ ভাব ভঙ্গী চাল চলন যে এদেশের নয়, বুদ্ধিমান অতুলচন্দ্রের তাহা বুঝিতে দেরী হয় না। অতুলচন্দ্র যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছেন। হইবারই কথা।

নববস্ত্রে ঐরূপ সজ্জিত হইয়াই বন্ধু-বিনোদিয়া বাংলার দিকে চলিলেন। যাত্রা করিবার অত্যল্পকাল পূর্ব্বে অতুলচন্দ্রকে নির্জ্জনে ডাকিলেন। অতুলচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধবৎ আসিলেন। অতি ধীর গম্ভীর ভাবে বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "দেখুন, দুঃখময় এই মায়ার সংসারে একমাত্র কৃষ্ণ ভজনই সার; আপনি মায়ায় আবদ্ধ থাকিবেন না, আপনার দ্বারা আমার অনেক কাজ আছে।"

কথা কয়টি চিরকালের পুরাণো কথা হইলেও স্থান কাল ভেদে ও প্রকাশ ভঙ্গীতে পাষাণে দাগকাটার মত মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিল। তদবধি অতুলচন্দ্র শয়নে স্বপনে ভাবিতে লাগিলেন, দুঃখময় সংসারে একমাত্র কৃষ্ণ ভজনই সার। ক্ষীরোদা দেবী অতুলচন্দ্রের ভাব অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

ভাই বোনে

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবান্।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

ব্রাহ্মণকান্দায় দেবী দিগম্বরী জগৎ-হারা শূন্য জগতে শূন্য প্রাণে চিন্তা তাপে সন্তাপিতা হইতেছেন। কত ভাবনা, কত কল্পনা, কত চিঠি পত্র লোক প্রেরণ, কত মনস্তাপ নিশি জাগরণ। দিদির অবস্থা বর্ণনার নহে। জগদ্বন্ধুর কল্যাণের জন্য মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করিতে বসিয়া দিদি নিরর্গল ধারায় কাঁদেন, সারা রাত্র ভরিয়া নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া ডাকেন, আর ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। দিন আর কাটেনা, রাত্র আর পোহায় না। আহারে বসিয়া জগৎ জগৎ বলিয়া দিদি ভাত ফেলিয়া উঠেন, শয়ন করিয়া জগৎ জগৎ বলিয়া স্বপ্নে চমকিয়া জাগেন। সামান্য শব্দ পাইলে উঠিয়া দীপ জ্বালেন, দরজা খোলেন। বুঝিবা জগৎ আসিল।

দিদি কখনও যেন শোনেন, বাহির-বাড়ীতে "বড়দি-বড়দি"

বলিয়া জগদ্বন্ধু ডাকিতেছে। অমনি ছুটিয়া যান। গিয়া দেখেন ঝাউয়ের শাখায় উদাস বাতাস শর্‌শর্‌ করিতেছে। দিদি শূন্য বুকে করাঘাত করিয়া শূন্য আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকেন। কখনও ভাবেন, তবে কি পাবনার বিরুদ্ধবাদিরা জগৎকে একেবারে—। দিদি আর ভাবিতে পারেন না, দুই চোখ ফাটিয়া স্রোত বহিতে থাকে। মুছিতে মুছিতে অঞ্চল ভিজিয়া যায়। রাধা-গোবিন্দের মন্দিরের দুয়ারে আসিয়া কপালে করাঘাত করেন। শত শত বার মাথা কুটেন। জগৎসুন্দরকে হারাইয়া দেবী দিগম্বরীর জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিল।

গোপালচন্দ্র দিদিকে পাবনা গোলোকমণির কাছে পাঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। দিদিও তাহাই চান। সমান অংশীদারের কাছে না থাকিলে এ নিদারুণ বেদনা ভোগ করা যায় না। পাবনা গিয়া বোন গোলোকমণির গলা ধরিয়া জগৎ-জগৎ বলিয়া চোখের জল ফেলিতে পারিবেন—দিদির এই লাভ। আর এক বিশ্বাস দিদির এই যে, পাবনাতে জগদ্বন্ধুর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেও পারে।

ছুটির অবকাশে তারিণীচরণ বাড়ী আসিয়াছেন। তিনি দিদিকে লইয়া রওনা হইলেন। বাড়ীর ভৃত্য পেনা সঙ্গে চলিল। তারিণীচরণের অবকাশ কম। তাই তিনি কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত ট্রেনে আসিয়া পেনার সঙ্গে দিদিকে পাবনাগামী ষ্টীমারে বসাইয়া দিয়া পরবর্ত্তী গাড়ী ধরিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

ষ্টীমারের এক কোণের দিকে বসিয়া দেবী মুদ্রিত নয়নে

আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। কতদিন জগৎ শয্যা হইতে পলাইয়া গিয়াছে, আবার আসিয়াছে। কতদিন জগৎ লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাকে কাঁদাইয়াছে, আবার দেখা দিয়াছে। আজ কি তেমনি করিয়া আবার দিদির ভাঙ্গা বুকের তাপ জুড়াইয়া জগৎ তাঁহার নয়ন-পথগত হইতে পারে না! "ঠাকুর, জগৎকে দেখাইয়া প্রাণ রাখ, ঠাকুর! দোহাই তোমার।" দিদি তপ্ত নিশ্বাস ফেলিতেছেন।

দিদির মনটা আবার ঠাকুরের দিক হইতে জগদ্বন্ধুর দিকে আসিল। "ওরে জগৎ, ওরে নিষ্ঠুর, আর লুকাইয়া থাকিস্ না। তোকে না দেখিয়া আমার প্রাণ যে আর বাঁচে না।" ধ্যানমগ্ন সাধকের মত দিদি জগতের মুখখানি ভাবিতেছেন।

প্রভাতের আলো ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে। গড়াই নদীর তীরবর্ত্তী তরু শাখায় পাখীরা দিবসের আগমনী প্রভাতী রাগিনীতে ঘোষণা করিতেছে। সরোবরে পদ্মগুলি ফোটো ফোটো। গুণ গুণ করিয়া ভ্রমর যাত্রা করিতেছে। কি যেন আশায় দিদি দিগম্বরীর সন্তপ্ত নয়ন দুটিও উন্মীলিত হইতেছে। অন্তরের প্রাপ্তির পূর্ণতাতেই বাহিরের প্রাপ্তি। বিচ্ছেদ বেদনা যত গভীর, আন্তর প্রাপ্তি ততই নিবিড়। আন্তর প্রাপ্তি যত নিবিড়, বাহিরের প্রাপ্তি তত সহজ সরল ও সরস।

অই কে? কি সুন্দর মূর্ত্তি! একটি সাধু মৃগচর্ম্মাসনে অতি সরল ভাবে বসিয়া। দিদি মনে করিলেন, সাধুর কাছে গিয়া জগতের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন। দিদি দণ্ডায়মান হইয়া সাধুর বদন পানে চাহিলেন। দিদি চমকিয়া উঠিয়াছেন। এ কি!

এ যে জগৎ !! না—এ জগৎ না। জগতের মাথায় ঘন সন্নিবিষ্ট কৃষ্ণ কেশ। তাহা তো দেখছি না। জগতের তো মৃগচর্ম্ম ছিল না। দিদির মন যাহাই বলুক না, দিদির চক্ষু কিন্তু দৃঢ় ভাবেই বলে,—দিদি, এই সেই তোমার হারান ধন। যাঁর জন্য তুমি পাগলিনী, এই তো সেই অঞ্চলের নিধি।

আর একটু অগ্রসর হইয়া দিদি ভাল করিয়া মুখখানি দেখিলেন। এই তো সেই মুখ। চাঁদের জোছনা নিঙরান সতত ভাবনার ধন, সেই মুখখানি এই তো। আনন্দের প্রবল প্রবাহ দিদির ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। আবেগভরে বাষ্প-রুদ্ধ গদ্ গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"জগৎ, তুই এখানে।" দিদির ডাকটির আড়ালে যে একটি প্রীতির সমুদ্র ছিল, নবীন তাপসের সমস্ত গাম্ভীর্য্য তাহাতে মূহুর্ত্ত মধ্যে ডুবিয়া গেল। পঞ্চম বর্ষীয় বালকের সারল্যমাখা চাহনী চাহিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে তপস্বীও বলিলেন, "বড়দি, আপনি?" চারি চক্ষে ভাই বোনে মিলন হইল। অনন্ত বিশ্ব যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। বিশ্বের সকল সুখ ঘনীভূত হইয়া যেন একটা ক্ষণের মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। কল্পের পর কল্প-সৃষ্টি মধ্যেও বুঝি বিশ্ব-বিধাতা এমন একটা ক্ষণ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ধাতার সৃষ্টি সার্থক, যাহাতে এমন আনন্দ ঘন ক্ষণেরও উদয় হয়!

অধৃষ্য ও অভিগম্য

অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈ রিবার্ণবঃ

—শ্রীকালিদাস

জগৎসুন্দরের আদরের ডাকে দিদি দিগম্বরীর সকল বেদনা বিলীন হইয়া গেল। দিদি জগতের পার্শ্বে বসিয়া পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আনন্দে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ও জড় হইয়া আসিতে লাগিল। অনন্ত বিশ্বে একমাত্র নির্ম্মল প্রেমেরই নিত্যতা। ঐ বস্তু আছে বলিয়াই বিশ্ব সঞ্জীবিত। "কো হ্যেবাণ্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

অনেকক্ষণ হইতেই নবীন তপস্বীর অঙ্গচ্ছটা ষ্টীমারস্থিত নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু সে ভাস্বরতায় নয়ন মন ঝলসিয়া যাওয়ায় কেহই নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হয় নাই। এখন ভাইয়ের কাছে ভগ্নী বসিয়াছেন। বসিয়া বসিয়া যেন কত আদর ভরা পূর্ণ কুম্ভ ঢালিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতেছেন। এ স্নেহের অপ্রাকৃত অলকানন্দায় ষ্টীমারস্থিত সকলেই যেন স্নাত হইতে লাগিল।

প্রভু বন্ধুর শ্রীঅঙ্গের ছটায় মধ্যে একটা বিপুল ঐশ্বর্য্যের ঝলক আছে। ঐ ঐশ্বর্য্যের নাম শ্রীশক্তি। ঐ শক্তির বিকাশ চমকপ্রদ। উহাতে মনে হয় যে এ তেজস্বী বস্তু অধৃষ্য, ইহার কাছে যাওয়া অসম্ভব; আবার, সখ্য বাৎসল্যাদি রসের আশ্রয়ালম্বন কোন ভক্ত পার্শ্বে আসিলে ঐ ঐশ্বর্য্য লজ্জায়

সংকোচিত হইয়া বদন ঢাকিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। তখন সকলে দেখে, এ যে স্নেহের ধন, আদরের দুলাল, পরম অভিগম্য, ইহার অভিমুখে গমন করিতে লোভ হয়। বন্ধুসুন্দর ষ্টীমারের মধ্যে একাকী বসিয়াছিলেন আপন গৌরবে মহীয়ান, দুষ্প্রেক্ষ্য, অধৃষ্য, পরম তপস্বী। দিদির সান্নিধ্যে হইয়া গেলেন,—বাৎসল্যের বিষয়ালম্বন, পরম প্রেক্ষণীয় ছোট ভাইটি। ভীষণতার জন্য মহাসমুদ্রের কাছে যাইতে ভয় হয়। আবার রত্ন আছে বলিয়া ডুবুরী ডুবায়। ঐশ্বর্য্য ভয় লাগায়, মাধুর্য্য আকর্ষণ করে। বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্যময় মহাসমুদ্রের মত বন্ধুসুন্দর ষ্টীমারের মধ্যে দিদির পার্শ্বে বিরাজ করিতে লাগিলেন। স্নেহের ধনটির আকর্ষণে কতজন অপার ব্যাকুলতা লইয়া সে মহাগম্ভীর মহাসমুদ্রের সৈকত ভূমিতে দাঁড়াইল।

"অ-স্বতন্ত্র ইব"

"অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ"

—শ্রীভগবান

দীর্ঘ দিন জগৎসুন্দরের অভাবে দিদি যে কী মনোবেদনায় ম্রিয়মানা হইয়া কাটাইতেছিলেন, তাহা তিনি সবই তখন ভুলিয়া গেলেন। মনে মনে নিষ্ঠুর বলিয়া কত ভৎর্সনা করিয়াছেন। কিন্তু কাছে পাইয়া আজ আর তাহা মুখে আসিল না, মনেও আসিল না। যেন "সদ্যনষ্টস্মৃতি" হইয়া গেলেন। জগৎ-

এতদিন কোথায় কি করিয়াছে, তাহাই জানিবার জন্য দিদি আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

জগৎসুন্দর নানা দেশের নানা কথা দিদিকে বলিতে লাগিলেন। ব্রজের ধূলি দিদির হাতে দিয়া বলিলেন, "বড় দি, এই নেন, যুগল কিশোরের পদরজঃ।" দিদি তাহা হইতে একটু নিজের মাথায় ও একটু জগতের মাথায় দিয়া, বাকিটুকু আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলেন। বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "দিদি, আমি আড়াতে ক্ষারুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছি। তারপর, বরাবর কুষ্ঠিয়া আসিয়া পাবনা যাইব মনে করিয়া এই ষ্টীমারে উঠিয়াছি।"

ষ্টীমার পাবনার ঘাটে পৌঁছিল। বন্ধুসুন্দরের ইচ্ছা ছিল বৈদ্যনাথ চাকীর বাড়ীতে উঠেন মনে মনে সেইরূপ সংকল্প করিয়াই পাবনা আসিতেছেন। কিন্তু সত্যসংকল্পের সংকল্প টিকিল না। বড়দি সঙ্গে থাকায় তাঁহার ইচ্ছার উপর কোন একটি কথাও বলিবার সামর্থ্য ইচ্ছাময়ের রহিল না। মহারাজ অম্বরীষের নিকট কৃতাপরাধ ভীত ত্রস্ত দুর্ব্বাসা ঋষিকে একদিন শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, "শুন দ্বিজ আমি ভক্ত পরাধীন, স্বতন্ত্রতা মোর কিছু মাত্র নাই।" যিনি, সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন স্বরাট পুরুষ, স্নেহের বাঁধনে তিনি নিতান্তই অসহায়। নারদ তাইত বলিয়াছেন, "ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

স্বতন্ত্র ঈশ্বর বন্ধুসুন্দর আজ ক্রীড়নকের মত দেবী দিগম্বরীর অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঘাটে লোক আসিয়াছে। বুঝিবা, প্রসন্নকুমার লাহিড়ী পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া, পাঠাইয়া

থাকিবেন। দিদিমণির সঙ্গে বন্ধুমণি গোলোকমণির গৃহে উপস্থিত হইলেন।

দেবী গোলোকমণি স্বপ্নের অগোচর দৃশ্য দর্শন করিতেছেন। আগে বড়দি আসিতেছেন। পশ্চাতে অঞ্চলের ধন জগৎ সোনা আসিতেছে। কী আনন্দ! বেদনার মরুপ্রান্তে যেন একখানি মিলনের পুষ্প শয্যা। যাঁহার জন্য দুই বোনই ঠাকুর দেবতার দুয়ারে কত নয়ন-ধারা ঢালিয়াছেন। কত বিনিদ্র রজনী স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন। আজ যাহার জন্য একত্র হইয়া কান্দিতেই দুই বোন মিলিত হইয়াছেন, সেই ধনকে অপ্রত্যাশিত ভাবে কোলের মাঝে পাইয়া দুই জনেই আনন্দ পয়োধিনীরে সাতার কাটিতে লাগিলেন।

দেবী গোলোকমণির অন্তরে গভীর আনন্দ, বাহিরে প্রবল অভিমান। দেবী জগতের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া দিদি দিগম্বরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড়দি, ভাগ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, তাই জগত আমার বাড়ী এল। তা নৈলে আর আসতো! সেবার পাবনা আসিয়া ও আমার এখানে আসে নাই। একটা খবরও দেয় নাই। মনটাকে পাষাণে বাঁধিয়া ভাবিয়াছি, "আমরা জগতের কেউ নই।"

জগতের দিকে স্নেহমাখা চক্ষে চাহিয়া মৃদু ভৎর্সনার সুরে দিদি কহিলেন, "সে কি রে জগৎ, পাবনা আসিয়া এখানে আসিস্ নাই। কী নিষ্ঠুর তুই।" দিদিদের কথা শুনিয়া বন্ধুসুন্দর ধীরে ধীরে স্মিতমুখে কহিলেন, "দিদিমণি, আপনার এখানে যে আসিনা, তার কারণ আছে। এখানে আসিলেই

সবাই কেবল জিজ্ঞাসা করে, কে আমাকে প্রহার করিয়াছিল। বারংবার জিজ্ঞাসায় শেষে যদি কাহারও নাম মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যে আমার উদ্ধারণ ব্রত ভঙ্গ হইয়া যাইবে।"

কথা কয়টি বলিবার সময় জগৎসুন্দরের রাঙা মুখ খানি আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। গাম্ভীর্য্য-মাখা বদনে একটা করুণার রেখা বিদ্যুল্লেখার মত ঝলক দিল। দিদি তাহা দেখিলেন। দেখিয়াও দৃষ্টি বক্র করিয়া কহিলেন, "বড়দি, শুন্‌লেন ত পাগলের পাগলামি।"

বন্ধুসুন্দরের আগমন সংবাদ পাইয়া প্রিয় সঙ্গীগণ দলে দলে ছুটিয়া আসিলেন। চিরপ্রসন্ন প্রসন্নকুমারের ঘরের দুয়ারে বুড়োশিব হারাণ ক্ষেপা আসিয়া বগল বাজাইয়া, "আমার জগারে জগা, আমার জগারে জগা" গান গাহিলেন। ক্ষেপার নৃত্য দেখিয়া জগৎ সুন্দর শ্রীমস্তক দুলাইতে দুলাইতে ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। গবাক্ষ পথে দুইবোন ভাই-জগতের ভঙ্গীময় নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের রোল উঠিল। ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে পাবনা সহর সহরতলী মুখর হইয়া উঠিল।

"প্রেম রোল অবিরল অম্বর ছায়।"

মহাভাবের ঠাকুর

"ভাইরে, ত্যজিয়াছি গোলোক আসন।
আমার রাধা মন্ত্র জপ-তপ হৃদয়-ভূষণ॥"

—শ্রীবন্ধু

"গোবিন্দ" "গোবিন্দ" ধ্বনি বন্ধুসুন্দরের বদনে লাগিয়াই আছে। কখনও স্পষ্ট কখনও অস্পষ্ট, কখনও মৃদু কখনও উচ্চে, কখনও দুলিয়া দুলিয়া, কখনও বা হাতে তালি দিয়া। কোথাও হরিনামের ধ্বনি শুনিলে রসের দেহ খানি যেন আনন্দে টলমল করে। গোবিন্দ নাম বলা যায়, হরে কৃষ্ণ নাম বলা যায়, শোনা যায়। কিন্তু "রাধা" এই দুইটি অক্ষর বন্ধু সুন্দর শ্রীমুখে উচ্চারণ আর করিতে পারেন না। শ্রবণেও গ্রহণ করিতে পারেন না। বলিলে বা শুনিলেই অত্যদ্ভুত ভাবাবেশ হয়। শ্রীদেহের রজত-ধবল বর্ণ বিবর্ণ হইয়া যায়। কখনও দেহ পাথরের মত শক্ত হইয়া যায়। কখনও বা দেহতরু কদলী পত্রের মত কাঁপিতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত চক্ষুর স্থির দৃষ্টি খানি পাগলের মত চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। কখনও ঐ অক্ষর দুইটি কাণে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে অবিরল ধারে অশ্রু গড়াইতে থাকে, তাহাতে বুকের বসন ভিজিয়া যায়। কখনও অপর্য্যাপ্ত ঘাম ঝরিতে থাকে, তাহাতে সর্ব শরীর স্নাত হইয়া যায়। কখনও দ্রুত গতিতে দৌড়াইয়া বন্ধু যেন আপনাকে

বাঁচাইয়া লন। শুধু "রাধা" এই দু'টি অক্ষর যে এমন সুদীপ্ত ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারে, ইহা কেহ কখনও দেখা দূরের কথা, শোনেও নহে। রাগবর্ত্মের পথিকদের নিকট ইহা নিভৃত কুঞ্জের গোপন প্রকোষ্ঠের এক রহস্যময় সংবাদ। কিন্তু তরলমতি লোকের কাছে ইহা এক কৌতুকাবহ খেলার বিষয়।

ক্লান্ত রবি রাঙা হইয়া পশ্চিম গগনে তেরছা ভাবে শয়ন করিতেছে। পাখীরা সবাই বাসায় ফিরিবার কথা ভাবিতেছে। ইছামতী কুলুকুলু ধ্বনি তুলিয়া নাচিতে নাচিতে পাবনার বার্ত্তা লইয়া সাগরে ধাইতেছে। বর্ষা কাল, তাই বেশ একটু স্রোত পড়িয়াছে। নদীর বোঝা ভারী হওয়ায় দুই তীর তাহা যোগ্যতানুযায়ী অংশ করিয়া লইয়াছে। নদীয়ার ভরা নদী যখন নীলাচলের গম্ভীরা সমুদ্রে গেল, তখন স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায় এই দুই কুলও সেই নদীর ভার ভাগাভাগি করিয়া বহিত। হায়! আজ ইছামতীর বুকে যে মহাভাবের দুর্দ্দাম প্রবাহ, তাহা বহন করিবার মত কোনও কূলে আর কেহ অংশীদার নাই! আজ একা সে স্ব-রসোন্মাদনায় উন্মাদ !!

নদীর মাঝখানে বহুকণ্ঠ সম্মিলিত একটা কলরব উঠিল। "রাধে-রাধে-রাধে" "রাধে-রাধে-রাধে।" তীরে ভ্রমণ-রত বহু নরনারীর দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। সবাই দেখিল, দশ বারটি পরিণতবয়স্ক বালক একখানা নৌকার উপর সমস্বরে বলিতেছে "রাধে-রাধে-রাধে।" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে

একটা ঝুপ করিয়া শব্দ, সবাই শুনিল। কোন বস্তুর জলে পতনের শব্দ। তীর হইতে অনেকে দেখিল যেন একটা পরমোজ্জল বিদ্যুতের খণ্ড সেই নৌকা হইতে ছুটিয়া জলে পড়িয়া গেল। নৌকার আরোহীরা দেখিল, চাঁদ খসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের প্রিয় জগদ্বন্ধু-সুন্দর আর নৌকায় নাই। যাহাকে ক্ষেপাইবার জন্য এই নৌকাখেলার ফন্দী, সে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। একদৃষ্টে সকলে জলের দিকে চাহিয়া রহিল। কি সর্ব্বনাশ!

সকলেরই গালে হাত, বিষণ্ণ-বদন, কাতর-দৃষ্টি। এ কী হইল। কোথায় গেল? কৌতুক করিতে আসিয়া এ কী পরিণাম হইল। এই খরস্রোতা নদীর মাঝে জগৎ সুন্দর কোথায় ভাসিয়া গেল। কেহ ভাবিল, জগৎ সাতার কাটিতে ভারী ওস্তাদ, এখনই উঠিয়া পড়িবে। কেহ ভাবিল, বন্ধু জলের উপর আসন করিয়া বসিতে নিপুণ—এখনই আসনস্থ অবস্থায় ভাসিয়া উঠিবে। কিন্তু এই সব ভাবনা আর বেশী সময় ভরসা দিতে পারিল না।

পরিহাসের পরিণতি যে এমন হইবে তাহা তাহারা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় বালকদল বিষাদ সমুদ্রে ডুবিল। নৌকার দাঁড় টানিতে আর কাহারও হাত চলে না। নৌকা স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া যায়। কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেই বন্ধুকে ভালবাসে। সকলেরই প্রাণে হাহাকার। কেহ ভাবিল, হায়রে! জগতে যদি রাধানাম না থাকিত তবে আর এমন হ'ত না।

"অই যে অই যে"—কয়েক জন সোল্লাসে চেঁচাইয়া উঠিল। "তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্" দেহে নব প্রাণ প্রতিষ্ঠার মত সকলে একযোগে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সকলে কোলাহল করিয়া দাঁড় টানিয়া নৌকা তীরে লাগাইল। সকলেই নামিয়া পড়িল।

একটা কুল গাছের তলে বসিয়া জগৎ সুন্দর কাঁপিতেছেন। বুকে হাটু ঠেকান। অঙ্গে বস্ত্র নাই। মস্তক অবনত, মুখে ফেনা উঠিতেছে। করুণ দৃশ্য। বালকেরা বেদনা-হত। হায় হায়! আমাদের অদূরদর্শিতার এমন মর্ম্মান্তিক ফল। দুই জন দৌড়াইয়া গেল। শুষ্ক বস্ত্র আসিল। ধীরে ধীরে কাপড় গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বন্ধুসুন্দর ইঙ্গিত করিলেন। সঙ্গীগণ বুঝিল কীর্ত্তনপ্রিয় বন্ধু কীর্ত্তন করিতে বলিতেছেন। হাতে তালি দিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

মানুষের ব্যাধি হয়, সারেও। বন্ধুসুন্দরের এই যে রাধা নাম বলিতে বা শুনিতে না-পারার ব্যাধিটি ইহা কদাপি সারে নাই। চির দিনই, কাহারও নাম রাধিকা, বলিবার উপায় নাই, বলিতেছেন সারিকা। কোনও গাঁয়ের নাম রাধানগর, বলার উপায় নাই, বলিতেছেন অমুক নগর। রাধাকুণ্ড হইতে পত্র আসিতেছে, চিঠির ভিতরে কোণে ঠিকানা "অমুক কুণ্ড।" রাধাকুণ্ডে স্নান করিবার উপায় নাই। শ্রীকুণ্ডের নীর স্পর্শ করিবার উপায় নাই। এ আলম্বন বিভাব কি উদ্দীপন বিভাব কে বলিবে? শ্রীকুণ্ড-বারিতেই রাধাঙ্গ বোধ, কিংবা

তদ্দর্শনে রাধাভাব উদ্দীপন—কে বুঝিবে! এ ভাবগহনে কে প্রবেশ করিবে! অন্দরের খবর সদরে কে আনিবে!

আজ নৌকা লইয়া কৌতুক করিতে গিয়া যে শিক্ষা লাভ হইল, তাহার ফলে ঐ ভাবের গাম্ভীর্য্য কেহ না বুঝিলেও, উহা লইয়া পরিহাস করিবার প্রবৃত্তি আর কাহারও কোনও দিন জাগে নাই। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ বন্ধুসুন্দরের ঐ ভাবের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত। প্রিয়জনের কার্য্য অনুকরণ করিতে প্রিয়জনের সাধ স্বাভাবিক। কিন্তু যে সকল ভাব বা অবস্থা সর্ব্বতোভাবেই তাঁহার নিজস্ব, স্বকীয় ভগবৎ স্বরূপানুবন্ধী, সেই সবই অননুকরণীয়। যে সব ব্যাপারের মূল উৎসটি অন্তর রাজ্যে, বাহিরে মাত্র কিঞ্চিৎ প্রকাশ, বাহির হইতে সেই কার্য্যের অনুকরণ একপ্রকার কৃত্রিমতা বিশেষ। কৃত্রিমতা আদরণীয় নহে।

কবিরাজ নৃত্যগোপাল আসিয়া বন্ধুসুন্দরের নিকট বলিতেছেন, "প্রভু, আপনার হরিদাস আপনার মত রাধানাম উচ্চারণ করে না, বলে অমুক।" বন্ধুসুন্দর প্রিয় হরিদাসকে নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। রায় হরিদাস আসিলেন। শ্রীমুখ তুলিয়া হরিদাসের দিকে তাকাইলেন। অতি সুগম্ভীর শ্রীমুখ হইতে একটি আদর মাখা তত্ত্বময় ভৎর্সনা বাক্য ফুটিয়া উঠিল,—

"হাঁরে, হরিদাস, ঐ নাম করবি না, তো তরবি কিসে!" লজ্জায় সংকোচে কৃত্রিমতার অপরাধে হরিদাসের মুখ লাল হইয়া উঠে। তাহার চক্ষের দৃষ্টি বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখ হইতে

শ্রীপদপঙ্কজে নমিত হয়। শ্রীশুকের সাবধান বাণী মনে পড়ে,—"নৈতৎ সমাচরেৎ যাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।" ঈশ্বর না হইয়া ঈশ্বরের কার্য্য মনে মনেও আচরণীয় নহে।

দেখুন! কী সুন্দর দেখায়!

বারশত সাতানব্বই সাল। শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগ। দেবী দিগম্বরী জগৎসুন্দরকে লইয়া পাবনা হইতে ব্রাহ্মণকান্দায় আসিলেন। আবার আনন্দের হাট বসিল। জগদ্বন্ধু স্বতন্ত্রতা ভালবাসে, দেখিয়া দিদি গোপাল চন্দ্রকে বলিয়া একখানি আলাদা ঘর তুলিয়া দিলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরের পাশেই এই ঘর। নূতন ঘরে গিয়া প্রভুবন্ধু বালকের মত পরম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নূতন লেপা ঘরের মেঝেতে একটি গো-বৎস অনেকক্ষণ পদচারণ করিয়াছে। বহুস্থানে তাহার ছোট ছোট ক্ষুরের চিহ্ন পড়িয়াছে। বন্ধুসুন্দর দিদিকে ডাকিয়া ঐ চিহ্নগুলি দেখাইয়া বলিলেন, "বড়দি, দেখুন কী সুন্দর দেখায়!"

ছোট বাছুরের পদচিহ্নের মধ্যে একটা দেখ্‌বার মত সৌন্দর্য্য কি আছে, দিদি তাহা বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তবে, ঐ কথা বলিবার সময় বন্ধুগোপালের শ্রীমুখে যে সারল্য ও বালমাধুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আস্বাদন করিয়া বাৎসল্যময়ী আনন্দে ভাসিলেন। দিদি সকলকে ডাকিয়া জগৎ কি বলে শুনাইতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী কালেও

কোনও লেপা জায়গায় গো-বৎসের পদচিহ্ন দেখিলে দেবীর জগৎসুন্দরের কথা মনে পড়িত। অমনি বলিতেন, এরূপ দেখিলে আমার জগৎ বলিত, "দেখুন কী সুন্দর দেখায়!"

বন্ধুসুন্দরের স্বতন্ত্রতা, বিহ্বলতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সর্ব্বদার জন্য সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেছেন। একা একা রজনীতে যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সারা রাত্র প্রায় গৃহেই থাকেন না। চারিদিক হইতে লোক আসে। কত ছেলেরা আসে। কত যুবকেরা আসে। তাহাদের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া গভীর রাতে মাঠে মাঠে বিচরণ করিতেছেন। কোথায় থাকিতেছেন, কি করিতেছেন, কেহই কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সর্ব্বদাই যেন একটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা, আনমনা ভাব, উদাস দৃষ্টি, "গোবিন্দ গোবিন্দ" "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" উচ্চারণ। দিদি দিগম্বরী সুযোগ পাইলেই নানা প্রকার প্রবোধ দানে জগৎসুন্দরকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করেন। গোপাল চন্দ্রও প্রীতির সহিত হিতোপদেশ দেন, মৃদু ভর্ৎসনা করেন। তাহাতে বন্ধুসুন্দরের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। শুনিয়া কেবল "গোবিন্দ গোবিন্দ" উচ্চারণ করেন। কখনও "হা ব্রজ! হা ব্রজনাথ!" বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়েন। যিনি প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবে কে?

দুঃখীরামের ধ্যান

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"

—বিশ্বকবি

জগৎঠাকুরের বিরহে ঘোষ দুঃখীরাম মনমরা হইয়া আছেন। আজ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া দুঃখীর সুখের সীমা নাই। ক্ষীর ছানা নবনীত দধি ঘৃত কত কি লইয়া দুঃখীরাম চক্রবর্ত্তী বাড়ী পৌঁছিয়াছেন। বন্ধুসুন্দরের রূপ মাধুরী দর্শনে দুঃখীরাম থমকিয়া দাঁড়াইতেছেন। দুঃখীরাম দেখিতেছেন সেই স্কুলে যাওয়া আদরের দুলালটি আর নাই! এখন সে এক নবীন তপস্বী। সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার সুদীপ্ত তপশ্চর্য্যার বিমল দ্যুতি। শ্রীমুখে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' মৃদু মধুর উচ্চারণ, নয়নে মুক্তাবিন্দু বিগলিত, চাহনীর মধ্যে কারুণ্যমাখা মাধুরী মূর্ত্তিমন্ত। নবীন তাপসের মনোমোহন আলেখ্যখানি দুঃখীরামের হৃদয় অঙ্গনে নব ভাবের উন্মাদনা আনিয়া দিল।

দুঃখীর চোখে আনন্দমাখা চমৎকৃতি। আপনাহারা অবস্থায় পরম আদর-ভরা সম্ভ্রমে আনীত ক্ষীর ছানা দিলেন। বন্ধুসুন্দর সে সকল রাধাগোবিন্দের মন্দিরে রাখিতে বলিলেন। আগে দুঃখীরামের আদরে বন্ধু নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেন। আজ কিন্তু অন্য মানুষ—গম্ভীর ধীর মহাতাপস। বন্ধুসুন্দর ইঙ্গিত করিয়া দুঃখীরামকে কাছে বসাইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দুঃখী, হরিনাম কর, যুগলকিশোর ভজন কর। নিতাই গৌরের নাম লও।" দুঃখীরাম দেখিলেন স্কুলের সেই

পাগল পাগল ছেলেটি আজ আচার্য্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত। কারুণ্যে ঢলঢল তার দৃষ্টিখানি।

দুঃখীরাম ভক্ত—মাতৃভক্ত। শাক্ত জনক জননীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শক্তি-উপাসক সাধকের নিকট শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা পাইয়াছেন। গুরুকৃপায় মাতৃ সাধনে অনেকটা উন্নতিও করিয়াছেন। দুঃখীরাম নিত্য সাধনে মা জগদম্বার সান্নিধ্য অনুভব করেন। মনে হয়, এক সময়ে মায়ের অপূর্ব্ব দর্শন পাইয়াছেন। বন্ধুসুন্দরের উপদেশ মত হরিনাম করা বা যুগলকিশোর ভজন করা তাঁহার পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। তিনি ঐ উপদেশ কর্ণগত করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই হৃদয়গত করিতে পারিলেন না।

সেইদিন হইতে দুঃখীরামের সাধন রাজ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে লাগিল। দুঃখীরাম মায়ের ধ্যানে বসেন, আর বন্ধুসুন্দরের অই নবকিশোর তাপস মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসে। দুঃখীরাম বন্ধুসুন্দরকে ভালবাসিয়াছেন, কিন্তু ইষ্ট বা আচার্য্য বুদ্ধিতে নহে। বন্ধুসুন্দর দুঃখীরামের কাছে সেই চক্রবর্ত্তীবাড়ীর জগৎঠাকুরই। তাঁহার উপর দুঃখীর স্নেহ আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে তো সে ধ্যান করিতে বসে নাই। কিংবা তাঁহার উপদেশও তাঁহার প্রতিপাল্য নহে।

আজ এ কী হইল! দুঃখীরাম মাকে ধ্যান করিতে বসিয়াছেন। ব্রাহ্মণকান্দার জগৎঠাকুর আসিয়া কেন তাঁহার বুক জুড়িয়া বসে? দুঃখী ইহাতে বড়ই বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন। ধ্যেয় বস্তুর এবম্বিধ দ্বৈধতায় উদ্বেগ হইবারই

কথা। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন দুঃখীরাম ঐ মূর্ত্তিকে হৃদয় হইতে সরাইতে অক্ষম হইলেন, তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

দুঃখী, তুমি কোন্ দেশের পাগল! যাঁহাকে শত সাধনা করিয়াও হৃদয়ে এক মূহূর্ত্ত পাওয়া যায় না, তাঁহাকে তুমি হৃদয় হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিতেছ! চেষ্টা করিয়াও পারিতেছ না বলিয়া বিরক্ত হইতেছ!! কিন্তু উপায় কোথায়? অযাচিত কৃপাকারী নিজেই যে তোমার হৃদয়টি বাছিয়া লইয়া তাহাতে আসন পাতিয়াছেন। অই শোন শ্রুতির ঘোষণা—

"যমৈবেষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"

স্বরূপদর্শন

"ষড়ভুজ মূর্ত্ত গৌর কৃষ্ণ রাম বন্ধু"

—স্মরণমঙ্গল

গভীর রজনী। অধিকাংশ নরনারী নিদ্রিত। দুঃখীরাম ধ্যানাবিষ্ট। ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন আর মাঝে মাঝে মা-মা ধ্বনি করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। নয়ন দুইটি প্রেমাশ্রুতে ভরা। সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত, কণ্ঠস্বর আবেগ পরিপূর্ণ। এবার ধ্যানে যেন মায়ের মূর্ত্তি স্পষ্টতর দেখিতেছেন। দুঃখীরামের মনকে একটি প্রশ্নই আলোড়িত করিতেছে। "মা জানিয়ে দাও, জগদ্বন্ধু কে?"

নয়ন ধারায় সিক্ত দুঃখীরাম বিহ্বলভাবে জগজ্জননীকে দেখিতেছেন। ঐ এক প্রশ্নই তাঁহার মনোমধ্যে সহস্রবার উঠানামা করিতেছে। দুঃখীরাম পশ্চাদ্দিক হইতে দৈববাণীর মত শুনিতে পাইলেন। "তুই যাকে ভজিস্ আমি তার বাবা।" সুপরিচিত কণ্ঠ। বিস্ময়ে কণ্টকিত-দেহ দুঃখীরাম অই কণ্ঠধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে নয়ন খুলিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, জগদ্বন্ধুসুন্দর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি অন্তর্ধান করিলেন। পরমূহূর্ত্তেই তৎস্থলে অপর একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব বিগ্রহ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। ছয়টি বাহু, তিনটি বর্ণ। দুইটি বাহু নব দুর্ব্বাদলশ্যাম, ঊর্দ্ধে উত্তোলিত। তাহাতে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়াছেন। দুইটি বাহু নবনীরদ কৃষ্ণ, শ্রীবক্ষের পার্শ্বে, তাহাতে মোহনমুরলী ধরিয়া অধরে ন্যস্ত করিয়াছেন। অপর দুইটি বাহু তপ্তকাঞ্চনবর্ণ করীশুণ্ডের মত দোদুল্যমান, তাহাতে দণ্ড কমণ্ডলু শোভা পাইতেছে। দুঃখীরাম অনিমিষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল।

রাত্রি প্রায় শেষ। দুঃখীরামের আবেশ কাটিল। স্থির প্রশান্ত দুঃখীরাম নয়ন মেলিলেন। আবার স্বপ্নদৃষ্ট রূপের কথা মনে পড়িতেই, সে গদগদ মুগ্ধ। তাঁহার লুব্ধ নয়ন সতৃষ্ণ। সেই অপরূপ রূপের তৃষ্ণা প্রখর হইতে প্রখরতর হইতেছে।

বিচারবুদ্ধি তৃপ্ত হইয়াছে, কিন্তু হৃদয়বৃত্তি অতৃপ্ত।

কি যেন একটি মহা অভাব, বুক জুড়িয়া অনুভূত হইতে লাগিল। মণিহারা ফণীর মত দুঃখীরামের প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া হাহাকার করিয়া উঠিতে লাগিল।

প্রকৃতিস্থ হইয়া দুঃখীরাম ভাবিতে লাগিলেন, "ইহা কী দেখিলাম। এ কি স্বপ্ন, না বাস্তব! ঘোর অন্ধকার নিশি, দ্বাররুদ্ধ, ইহারই মধ্যে জগদ্বন্ধু কি করিয়া আসিল! অন্য মূর্ত্তিই বা কী! ইহা নিশ্চয়ই স্বপ্ন!!" বস্তুতঃ, ইহা দুঃখীরামের প্রত্যক্ষও নহে, স্বপ্নও নহে। প্রত্যক্ষ ও স্বপ্নের অতীত যে ধ্যানরাজ্য, ইহা সেই ধ্যানরাজ্যেরই অপরোক্ষ অনুভব। এই অনুভূতি লাভ করিয়া দুঃখী আজ চিরসুখী হইলেন।

জগৎঠাকুরের স্বরূপতত্ত্ব সম্যক অবগত হইয়াও দুঃখী-রামের বাৎসল্যভাব বিন্দুমাত্র শিথিল হইল না। সকলই সেই ছলনাময়ী যোগমায়ার খেলা। লীলাপুরুষোত্তম স্নেহের কাঙাল বলিয়াই মনে হয়, লীলাশক্তি বুঝাইয়াও বুঝিতে দেন না। দুঃখীরাম ক্রমশঃ উহা স্বপ্ন ও মায়ার ব্যাপার মনে করিয়া তাঁহার আদরের জগৎকে স্নেহই করিতে লাগিলেন। ফুলচন্দন বা মালা দিয়া চরণপূজার ইচ্ছা তাঁহার হইল না। বরং স্নেহ যেন আরও বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি জগৎঠাকুরকে আরও বেশী ভালবাসিতে লাগিলেন, আরও বেশী আদর করিতে লাগিলেন। আরও গদগদ হইয়া নিঃসঙ্কোচে সে স্নেহধনকে ছানা নবনীত খাওয়াইতে লাগিলেন।

দুঃখীরামের বাৎসল্য এমনই একটি গৌরবময় উচ্চ আসনে সমাসীন যে, অত বড় ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি মধ্যে মধ্যে তাহার মনের

মধ্যে উঁকি মারিলেও, তাহা সঙ্কোচিত করিতে পারিতেছে না। সঙ্কোচিত করা দূরের কথা বরং আরও যেন উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। আমার স্নেহের ধন জগৎ সত্যই কি সেই পরম বস্তু—এই ভাবনা দুঃখীরামের প্রীতিরসকে গাঢ়তর করিয়া দিল। ধন্য খেলা!

নন্দ ঘোষ

ব্রাহ্মণকান্দা আপন মন্দিরে প্রভুবন্ধু একাকী বসিয়া আছেন। দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। বাহিরে পদচারণের শব্দ পাইয়া ভিতর হইতে বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠে কহিতেছেন,—

"কে রে?"

"আমি দুঃখীরাম।"

"কী চাও।"

দুঃখীরাম নীরব। "কি চাও" এ প্রশ্নের উত্তর দুঃখীরাম জানেন না। তিনি তো কোনদিন চাহিতে আসেন না—দিতেই আসেন। যে আপনাকে সম্পূর্ণ দিয়াছে, তার আর নেওয়ার ভাবনা কোথায়? আজ তবে হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? কি উত্তর করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া দুঃখীরাম বলিলেন,—"ভজন উপদেশ।"

ভিতরে কাগজের উপর কলম দিয়া লেখার খস্ খস্ শব্দ পাওয়া গেল। একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের অর্দ্ধেক খণ্ড দরজার উপরের ফাঁক দিয়া বারান্দায় গড়াইয়া পড়িল।

দুঃখীরাম তুলিয়া লইলেন। বিস্ফারিত নেত্রে পড়িলেন। পড়িয়া কাগজখানি মাথায় ছোঁয়াইলেন। বাষ্পপূর্ণ চক্ষু মুছিয়া আবার পড়িলেন। বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "দুঃখীরাম নন্দঘোষ।" মুক্তার মত কয়েকটা বড় জলের ফোটা দুঃখীর গণ্ড বহিয়া টস্ টস্ করিয়া সেই কাগজখানার উপর পড়িল। বন্ধুর হস্তাক্ষর হইতেও যেন অধিক গৌরবে সেই জলের অক্ষরগুলি শোভা পাইতে লাগিল।

"হা-ভাতে গোয়াল"

প্রভুবন্ধুর কৃপায় দুঃখীরাম জিতনিদ্র হইয়াছিলেন। সারা রাত্রি ভরিয়া ইষ্টচিন্তা করিতেন। কখনও কখনও ভাবনেত্রে দর্শন করিতেন, বন্ধুসুন্দর চরণ দু'টি দোলাইয়া মা দুর্গার হাতের নবনীত খাইতেছেন। দুঃখীরাম মানসে মা জগজ্জননীর হাতে ক্ষীর নবনী দিয়া বন্ধুধনকে খাওয়াইতেন। প্রত্যক্ষেও তেমনি ভাবে নিজ হাতে অর্পণ করিতেন।

বন্ধুসুন্দর দুঃখীরামের আদরে দেওয়া বস্তু "আরও দেও" বলিয়া আব্দার করিয়া চাহিয়া খাইতেন। একদিন দুঃখীরামের দোকানের ভিতরঘরে বন্ধুসুন্দর আহার করিতে বসিয়াছেন। দুঃখীরাম ঘৃতের পাত্র হইতে বন্ধুর পাত্রস্থিত গরম অন্নে ঘৃত ঢালিয়া দিতেছেন। ঢালিতে ঢালিতে আঙ্গুল দিয়া ঘৃত

আটকাইয়া পাত্রের মুখ মুছিয়া, পাত্র রাখিয়া দিয়াছেন। তাহা দেখিয়া বন্ধুসুন্দর স্মিতমুখে কহিলেন "হা-ভাতে গোয়াল, আঙ্গুলে কে'টে ঘি দেয়।"

দুঃখীরাম আর আঙ্গুলে না কাটিয়া পাত্রস্থিত সমস্ত ঘৃতই বন্ধুর অন্নে ঢালিয়া দিলেন। বন্ধুসুন্দরও দ্বিরুক্তি না করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রায় তিন পোয়া ঘৃতই অন্নের সহিত গ্রহণ করিলেন।

কীর্ত্তনোল্লাস ও পদ রচনা

"আস্বাদন বিতরণ ভরা পূর্ণতায়"

—ধ্যানমঙ্গল

এবার শ্রীশ্রীপ্রভুর ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে পদার্পণ করা অবধি মহা উৎসাহে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম প্রথম নিজ বাল্যসঙ্গীগণের সহিত পল্লীর বালকগণ, পরে ক্রমশঃ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ছোট বড় বহুবয়সের লোক আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন। কোথা হইতে উৎসাহ আসিতেছে, কোথা হইতে শক্তি সামর্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ের সমাধান হইতেছে, তাহার উৎস কেহই খুঁজিয়া পায় না। বালক বৃদ্ধ সকলেই যেন পুরাতন অভ্যস্ত কীর্ত্তনীয়া। তাহারা আসিতেছে। আরও কত কত অচেনা অজানা লোক পরিচিতের মত স্বাভাবিক ভাবে আসিতেছে। প্রাণ ভরিয়া কীর্ত্তন

করিতেছে। বাড়ীর কথা ভুলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে, কাজ-কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। স্নানের কথা আহারের কথা কিছুই যেন মনে নাই। "দেহ গেহ" সব বিস্মৃত হইয়া কীর্ত্তন করিতেছে।

সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে প্রাতে নিশীথে সকল সময়েই কীর্ত্তন চলিতেছেন। কে চালায়! কোথা হইতে কীর্ত্তনের দল আসে! কে-ই বা আনে! কে গায়, কে বাজায়, কে ভক্ত-সেবা করায়! সে এক অভূতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় ব্যাপার। ব্রাহ্মণ-কান্দার বাড়ীতে দিনের পর দিন অলৌকিক কাণ্ড চলিতে লাগিল। কীর্ত্তন আনন্দরূপী বন্ধুর কীর্ত্তন রসের আস্বাদন ও বিতরণ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলিতে লাগিল।

নূতন নূতন কীর্ত্তনের দল আসে। তাহারা সরলভাবে প্রাণের জন বন্ধুসুন্দরের কাছে আব্দার করিয়া বলে, "পিরভু, আমাগো একটি গান দেন।" যেমন চাওয়া, অমনি লিখনী ধরা, অমনি আবেশ, অমনি গান হইয়া গেল। একটি ভ্রম সংশোধন নাই। কবিতা মিলাইতে, সুর মিলাইতে একটু কাটা কুটি নাই। সুস্পষ্ট সুপরিচ্ছিন্ন পরিষ্কার বড় বড় অক্ষরে বড় বড় কাগজে লেখা। নূতন গান পাইয়া ভক্তের কি আনন্দ! এক দলে গান পাইল—আর দশ দলের লোক তাহা নকল করিয়া লইল। নানাজনে নানা সুর আওড়ায়। একজন প্রভুবন্ধুর নিকটে আসিয়া জোড়হাতে বলে, "পিরভু, সুরটা শিখাইয়া দেন।" প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে শিষ দেওয়া আরম্ভ হয়। কি মধুর শিষ, যেন বংশীধ্বনি।

প্রাণ গলিয়া যায়। মানুষ বিশ্বজগৎ ভুলিয়া যায়। পশুপক্ষী মূক হইয়া চাহিয়া রয়।

ভক্তেরা গান পাইলেন, মধুর শিষ শুনিলেন। শিষের মধ্যে রাগিণীর মূর্ত্তি দেখিলেন। আঙ্গুলের তুড়ির মধ্যে তাল শিক্ষা পাইলেন। আর কি বাকি থাকিল। মনে সাধ একজোড়া করতাল পান। সঙ্কোচে বলিতে পারিতেছেন না। প্রাণের ঠাকুর তখনি বলিতেছেন। "এই নাও করতাল, সকাল সন্ধ্যা নিত্য কীর্ত্তন করিবে।" আনন্দে পূর্ণ হইয়া তাঁহারা নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। একান্তই যখন কীর্ত্তন ছাড়িয়া বাড়ী যাইতে হইতেছে, তখন পথে তাঁহারা আপন মনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত-ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছে। এইভাবে নিত্য কাহারা আসিতেছে কাহারা যাইতেছে, কেহ কাহারও খোঁজ খবর রাখিতেছে না। একটা উদ্বেলিত আনন্দ, বিপুল কীর্ত্তনোল্লাস।

প্রভুবন্ধুর সকল গানই ভাবাবেশে রচিত। তাহাতে অপূর্ব্ব শক্তি, অনির্ব্বচনীয় মাধুরী। নব নব সুরের তরঙ্গ মন মাতাইয়া তোলে। প্রত্যেকটি পদ, প্রত্যেকটি অক্ষর, সুগভীর তত্ত্বগর্ভ। তাহার মধ্যে ভাব ও রসের জীবন্ত প্রবাহ বহমান। কীর্ত্তনে খোল করতালে যখন সে পদকদম্ব আস্বাদিত হয়, তখন আনন্দের প্লাবন আসে। যে গায় সে পাগলপারা হয়। যে শোনে সে আত্মহারা হয়। আখরে আখরে যে মাধুর্য্যের ফোয়ারা ছুটে, তাহা অনুভবী ছাড়া বুঝিবে কে, কেই বা বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিবে। সর্ব্বপ্রথম হইল আবাহন গান।

এস এস নবদ্বীপ রায় দীনজন ডাকছে হে তোমায়।
আমি ভব ঘোরে ঘুরে ঘুরে আচ্ছন্ন মোহ মায়ায়॥
তুমি সংকীর্ত্তনেশ্বর, তুমি ন'দে সুধাকর
এবার, বিতরি' করুণা সুধা রক্ষ চরাচর।
প্রভু, তুমি বিনে এ দুর্দ্দিনে অন্ধকার সমুদয়॥
কোথা নিতাই গুণধর, কোথা প্রাণ গদাধর,
রামানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস ভক্তবর।
লয়ে এ সকলে কুতূহলে গৌর এস গো ত্বরায়॥
ওহে শচীর দুলাল, তুমি পরম দয়াল,
ত্বরায় এ'সে ঘুচাও দাসের সংসার জঞ্জাল।
দাসে দয়া কর গুণাকর বিকাশি' বিমল কায়॥
আমি জ্ঞান গতিহীন, ভক্তি ভজন বিহীন,
গ্রহ কোপানলে দেহ দিনে দিনে ক্ষীণ।
ভে'সে নয়ন জলে বন্ধু বলে রেখ গৌর রাঙ্গা পায়॥

এই প্রথম গান। এই গান কীর্ত্তনে যে তুমুল রোল উঠে, যে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়, প্রেমোন্মাদনার যে তুফান বহিয়া যায়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ কখনও দেখে নাই, শোনে নাই বা কল্পনা করে নাই। বিপুল উদ্যম ও প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত কীর্ত্তনে "মাতান" উঠিয়া যখন "জমাট" বাঁধে, তখন "নবদ্বীপ রায়" শ্রীগৌরহরি, "গুণধর" নিতাইচাঁদ, "প্রাণ গদাধর" "অদ্বৈতচন্দ্র" ও "ভক্তবর" শ্রীবাসচন্দ্র সাক্ষাৎ ভাবে সশরীরে উদয় হয়েন। মানসচক্ষে সবাই দেখেন, অনুভব

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

করেন, আস্বাদন করেন। ভাগ্যবান কেহ কেহ প্রকাশমান পঞ্চতত্ত্ব চর্ম্মচক্ষেও প্রত্যক্ষ করেন। "ন'দে সুধাকর" "বিমলকায়" "বিকাশি" "অন্ধকার সমুদয়" বিদূরিত করিতেছেন।

পঞ্চতত্ত্ব সমুদিত হইলে বন্ধুসুন্দরের দ্বিতীয় গান আরম্ভ হয়।

ভজ নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ যদি যাও গোকুল বৃন্দাবন।
ও সে, নিত্যানন্দ প্রেমদাতা গৌরাঙ্গ পরম ধন॥
দন্তে তৃণ ধরিয়ে, নিতাই বলে যাচিয়ে,
ভজ গৌরহরি মোরে লহ কিনিয়ে।
নিতাই এত বলি' পড়ে ঢলি' ভাবেতে হ'য়ে মগন॥
রাধা প্রেমে ঢল ঢল, দু'টি আঁখি ছল ছল,
কেঁদে নিতাই বলে সবে বলরে হরি বল।
লহ নামামৃত হব ক্রীত ভজরে শচীনন্দন॥
লহ লহ হরিনাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
ক্রমে পাইবেরে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম।
ও সেই, গৌর রূপে নয়ন সপে সফল কররে জীবন॥
বন্ধু কয় ধীরে ধীরে, ভেসে নয়ন নীরে,
রেখ নিতাই গৌর দাসে চরণ তীরে।
আমার নাই কোন বল পথ সম্বল,
নাই গৌর সাধন ভজন॥

তালে মানে, লয়ে সুরে, ভাবে রাগে, রসে প্রেমে, খোলে করতালে, গানের এই মধুমাখা পদগুলি যখন পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতে থাকে, তখন নিতাইচাঁদের মোহন মূর্ত্তিখানি সকলের

নয়নের সম্মুখে নিপুণ তুলিকাঙ্কিত উজ্জ্বল চিত্রের মত ফুটিয়া উঠে। "রাধা প্রেমে ঢল ঢল" "দুটি আঁখি ছল ছল" "ভাবেতে মগন" প্রেমদাতা নিত্যানন্দ "দন্তে তৃণ ধরিয়ে" "মোরে লহ কিনিয়ে" বলিয়ে আপনাকে "যাচিয়ে" চলিয়াছেন। বলিতেছেন, সবাই "নামামৃত লহ" আমি বিক্রীত হইব, সবে "হরিনাম লহ" "মনস্কাম পূর্ণ হবে" ; ঐ গৌর রূপে নয়ন সমর্পণ করিয়া 'জীবন সফল কর।" "নয়ন নীরে ভেসে" বন্ধুসুন্দর যে কথা "ধীরে ধীরে" কহিতেছেন, সে কথা সকলের কাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া অন্তরে অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে। বন্ধুসুন্দরের শিক্ষা, উপদেশ, প্রাণের কথা যাহা, যাহা, সবই যেন এই দুইটি গানের মধ্যে জীবন্তভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

অনেক সময় বন্ধুসুন্দর কীর্ত্তনের মধ্যে আসিয়া পদ্মাসনে বসেন। কীর্ত্তনে যখন তুমুল রোল ওঠে, তখন সে আনন্দ তরঙ্গের প্রবল উন্মাদনায় বন্ধুসুন্দর অই পদ্মাসনে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ধূলায় গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করেন। সে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। সে অদ্ভুত ভাববিহ্বলতা ও ধূল্যবলুণ্ঠন দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হইতে থাকে। সকলে দেখে—কীর্ত্তনের পদে যাঁহার ভাব-মাধুরী বর্ণিত, সেই পরম ধন সাক্ষাৎ উদিত হইয়াই প্রেমে রসে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঢলিয়া গলিয়া পড়িয়াছেন। আনন্দে অধীর হইয়া সকলকে "নামামৃত" বিলাইতেছেন। নিজ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও লীলাচাতুর্য্যে জীবকুলকে আকৃষ্ট করিয়া নিতাই গৌরের চরণোন্মুখী করিতেছেন। তাহাদিগকে "গোকুল বৃন্দাবনের" পথে লইয়া যাইতেছেন। কীর্ত্তন ছাড়িয়া গৃহে

ফিরিবার কালে সকলের মুখে একটি কথা উচ্চারিত হইতেছে "সোনার মানুষ, সোনার মানুষ! এ যে সাক্ষাৎ নিতাইচাঁদ!!"

শ্রাবণের শেষ বন্ধুসুন্দর ব্রাহ্মণকান্দায় আসিয়াছেন। তারপর ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, উৎসব আসিল। প্রাণস্পর্শী কীর্ত্তনানন্দ হইতেছে। চক্রবর্ত্তী বাড়ী মা জগজ্জননীর অর্চ্চনায় ষষ্ঠী হইতে বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত কয়েকদিন কীর্ত্তন চলিয়াছে। একদিকে দুর্গোৎসব, অন্যদিকে কীর্ত্তনোৎসব। ব্রাহ্মণকান্দা ও নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহ টলমল করিতেছে। চারি শতাব্দী পূর্ব্বে নদীয়ার ঘরে ঘরে যে কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিয়াছিল, আজ ব্রাহ্মণ-কান্দাতে তাহারই পুনরাবির্ভাব। আজ আবার কীর্ত্তনের রসে শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইতেছে, হরিনাম রোলে প্রান্তর কান্তার মুখরিত হইতেছে, আনন্দ উচ্ছ্বাসে ধরণীর গাত্র পুলক কদম্বে কণ্টকিত হইতেছে। ভক্ত হৃদয় মহাপ্রেমে উৎফুল্ল হইতেছে। পতিত পাষণ্ড উদ্ধারণের পথে ছুটিতেছে।

নদীয়ায় "উদ্ধারণ উদ্দীপনে" কখনও শ্রীগদাধর রূপে কখনও "দশমী ভকতি" নিতাই ভাবে, কখনও বা "দশমী শিহরি" স্বয়ং শ্রীবন্ধুসুন্দর স্ব-স্বরূপে কীর্ত্তনের পদ সৃষ্টি ও আনন্দ বৃষ্টি করিতেছেন। দিদি দিগম্বরী, ভগিনী নিস্তারিণী সহ সমাগত শত সহস্র ভক্তের সেবা পরিচর্য্যায় আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন। এক বিরাট আনন্দ যজ্ঞ। আজ মহাসমারোহে ব্রাহ্মণকান্দায় নদীয়া শান্তিপুরের "হাট পত্তন" হইতেছে। ধন্য ব্রাহ্মণকান্দা গ্রাম। ধন্য লীলাধাম॥

মাসব্যাপী কীর্ত্তনোদ্‌ঘাপন

মাসের সেরা কার্ত্তিক মাস সমাগত। কার্ত্তিক মাসটি শ্রীরাধা দামোদর ও তাঁহাদের সেবকগণের বড় আদরের মাস। এই কার্ত্তিকে গোবর্দ্ধন ধারণ, এই কার্ত্তিকেই কাত্যায়ণী ব্রত। এই কার্ত্তিকেই বস্ত্র হরণ, এই কার্ত্তিকেই লীলা-শিরোমণি রাসলীলা। মাঠভরা ধান লইয়া প্রকৃতিদেবী রাধা দামোদরের পূজার অর্ঘ্য সাজাইতেছেন। আকাশে প্রদীপ জ্বালাইয়া কুলবালাগণ স্বর্গপথ আলোকিত করিতেছে। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর কীর্ত্তন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, সমগ্র কার্ত্তিক মাস ব্যাপী। ভাদ্র আশ্বিন দুই মাস কীর্ত্তনের মধ্যে কিছু কিছু বিরাম বিরতি ছিল। কার্ত্তিকের প্রথম দিন হইতে অবিরত অবিশ্রাম কীর্ত্তন চলিতেছে।

যশোহর রোডের সুন্দর ঝাউ বীথির পার্শ্বে অদূরে সবুজ মাঠের মাঝখানে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীখানি। স্বভাবতঃই সুন্দর। আজ ভক্তগণের হাতে আরও সাজ পরিয়াছেন। নানা বর্ণের পুষ্প বৃক্ষ। নানাপ্রকার পাতাবাহার, মাধবীলতা, কুঞ্জলতার মনোরম শোভা। কেবল নয়নমুগ্ধকর নহে, সর্ব্বেন্দ্রিয় মনোহর। লীলাকীর্ত্তনের মধুর রোলে কর্ণ উল্লসিত। পুষ্প চন্দন ও বন্ধুচাঁদের অঙ্গগন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আমোদিত। বন্ধু সরসীর স্বাদু নীরে ও প্রসাদী ফুল বাতাসা ছানা ক্ষীরে রসনা তৃপ্ত। পঞ্চবটীর শাখা আন্দোলনকারী বহমান সমীরণ, শেফালী ফুলের আস্তরণ, তৃণশষ্পের আচ্ছাদন সব লইয়া

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

রজরাণী ও বনদেবী স্পর্শসুখ বিধান করিতেছেন। এই সর্ব্বেন্দ্রিয় সুখকর শ্রীধামের মধুর আবেষ্টনীর মধ্যে আজ শ্রীবন্ধুসুন্দরের করাঙ্কিত নূতন গানের আবির্ভাব হইয়াছে।

গাওরে আনন্দ ভরে হরে কৃষ্ণ নাম।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বল অবিরাম॥
করতাল মাদলে নাচ হরিবলে
হরিনামের আগে তুচ্ছ ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
গোপাল গোবিন্দ হরে গাও সবে প্রেম স্বরে
দামোদর গিরিধর নব ঘনশ্যাম।
কর্ম্মকাণ্ড পরিহরি প্রেমে বল হরি হরি
বন্ধু বন্ধু ভনে হরিনামে পাবিরে বিরাম॥

অবিরাম হরেকৃষ্ণ নামের ধ্বনি আকাশে বাতাসে তরঙ্গ তুলিতেছে। করতাল মাদলে কীর্ত্তন নর্ত্তন চলিতেছে। পূর্ব্বে হরিনামে "ক্রমে পাইবে রে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম" বলিয়া পুরুষার্থ লাভেচ্ছু সকল মানবকে লোভ দেখাইয়া ডাকিয়াছেন। আজ হরিনামের আগে যে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুচ্ছ তাহাই দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিতেছেন।

হরিনাম যে কোন পার্থিব লাভ বা আরামের লোভে করণীয় নহে, তাহাই বুঝাইতেছেন। উহার ফলে কিন্তু "পাবিরে বিরাম।" এ' বিরাম মোক্ষ কৈবল্য নির্ব্বাণের নীরস বিরাম নহে। প্রেমের সরস বিরাম। যে সরস বিরামে লীলা-পুরুষোত্তম গোয়ালিনী যশোদার করে উদূখলের সঙ্গে রজ্জুবদ্ধ

হইয়া "দামোদর" নাম লইয়াছেন। যে প্রেমের বিরামে পরাৎপর ব্রহ্ম গোপবধূলম্পট সাজে রাসৌলীতে নৃত্য করিয়াছেন—এ সেই বিরাম, প্রেমের বিরাম, প্রীতিরসের বিরাম। এই বিরাম হরিনামেই লভ্য হইবে। কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ড কোনদিনই সে প্রেমের বিরামের আস্বাদন লাভ করে নাই। তাই সকল জীবের পরমবন্ধু যে "বন্ধু" তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্বমানব সভায় ঘোষণা করিতেছেন।

"কর্ম্মকাণ্ড পরিহরি প্রেমে বল হরি হরি
বন্ধু বন্ধু ভনে হরিনামে পাবিরে বিরাম"

এ' ঘোষণা, এ' মঙ্গলময় ধ্বনি বাহকরূপে পবনদেব পূর্ণ একটি মাস ভরিয়া জগজ্জীবের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিলেন। আনন্দের রোলে জগৎ ভরিয়া গেল। তিনলোক পরম আনন্দে নিমগ্ন হইল।

মাসান্তে সংক্রান্তির দিন চতুর্দ্দশ মর্দ্দলনে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিয়া মাসব্যাপী উৎসব উদ্‌যাপিত হইবে, শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রাণে এই ইচ্ছা জাগিল। সংক্রান্তির মাত্র চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে নিজ প্রাণের ইচ্ছা প্রিয়জনদিগকে জানাইয়া দিলেন। আদেশ শিরে লইয়া প্রতাপ ভৌমিক, দুঃখীরাম ঘোষ, জলধর, গদাধর, ঈশ্বর মাষ্টার, সুধন্ব মিত্র প্রমুখ উদ্যোগী প্রিয় ভক্তেরা চারিদিকে কীর্ত্তনের দল নিমন্ত্রণ করিতে চলিলেন।

সুধন্বকুমার অক্লান্ত ভাবে খাটিতে লাগিলেন। ইনি ফরিদপুরের জেল-কর্ম্মচারী কৃষ্ণচরণ মিত্র মহাশয়ের মধ্যম পুত্র।

যৌবন বয়স। সুপটু দেহ। সুচতুর বুদ্ধি। দুঃখীরামের নিকট ব্রাহ্মণকান্দার মধুবনের সন্ধান পাইয়াছেন। তাই লোলুপ ভ্রমরের মত আসা যাওয়া আরম্ভ করিয়াছেন। অভিভাবক বিরূপ, তাই গোপনে আসেন। বন্ধুহরির কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। তাই ধীর নত অনুগত ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দশ মর্দ্দলনের আয়োজনে অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সুধন্বকুমারও নব উদ্যমে মাতিয়া গিয়াছেন। ধন্য সুধন্য। এই ভাব যদি স্থির রাখ, তোমার পিতৃদত্ত নাম সার্থক হইবে। প্রিয় বন্ধুর ইচ্ছা হইলে হে মিত্র, তোমার মিতালিও নিত্য হইবে।

"চতুর্দ্দশ মর্দ্দলন" শব্দটিও কেহ কোন দিন শোনে নাই। চতুর্দ্দিক হইতে জলস্রোতের মত নর নারী বালক বৃদ্ধ আসিয়া সমবেত হইয়াছে। কত কত কীর্ত্তনীয়া সদল বলে উপস্থিত হইয়াছেন। কত কত নিপুণ বাদক নব নব বস্ত্রে বাঁধা নানা আকারের মৃদঙ্গ স্কন্ধে অধীর আবেগে দণ্ডায়মান। কলিকাতা ও নবদ্বীপ হইতে ঝাঁজ, কাঁসর, আশা, খুন্তি, বিউগল, নানা বর্ণের পতাকা, বৃহৎ শিঙ্গা প্রভৃতি উপচার লইয়া দুঃখীরাম ও প্রতাপ সবে মাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ধনাঢ্য জন ভারে ভারে চাল ডাল শাক তরকারী কলা মোচা থোর পাতা পাঠাইয়াছেন।

জননীগণ পাত্র ভরিয়া মিষ্টান্ন সর ননী প্রভৃতি ভোগের দ্রব্য আনিতেছেন। সুবেশা বধূগণ কলসী ভরিয়া জল আনিতেছেন। কেহ শাকের ঝুড়ি, কেহ তরকারীর ঝাঁকা, কেহ ফলের ডালা কেহবা সন্তান ক্রোড়ে লইয়া উৎসবে যোগদান

করিতেছেন। কন্যাগণ সাজিভরা পুষ্পমাল্য হস্তে আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে আসিতেছেন। কেহবা পূর্ব্বাহ্ন হইতে নিবিষ্ট চিত্তে মালাই গাঁথিতেছেন। সর্ব্বোপরি দিদি দিগম্বরী সকল দিক লক্ষ্য রাখিয়া যোগ্যজনে যোগ্যকার্য্যে আদেশ করিতেছেন। মাঝে মাঝে সকল কাজ রাখিয়া এক মুহূর্ত্ত জগৎসুন্দরের মুখখানা দেখিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীটি শ্রীবাস অঙ্গনে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বত্র আনন্দ কোলাহল। হরি হরি রব। জয় জয় ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে দশদিক মুখরিত।

সাত সম্প্রদায়

আজ সংক্রান্তি দিবস। নূতন প্রভাতী গান রচিত হইয়াছে। নূতন গান, নূতন রাগ, নূতন সুর, নূতন ঝঙ্কার। অতি অভিনব মাধুরী। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ঈশ্বর মাষ্টার ও নিবারণ দাস গান ধরিয়াছেন।—

উঠ উঠরে গুরু গৌরাঙ্গ বলে
প্রেমস্বরে প্রাণ ভরে কুতূহলে।
করজোরে কাতরে, ডাকরে বিশ্বম্ভরে,
গৌর গদাধর জয় বল সকলে।
হারে রে ওরে ভাই, হের আর নিশা নাই,
গৌর নিত্যানন্দ নাম গাও বিহ্বলে।

ত্যজরে মোহঘোর, মহাপাপ কঠোর,
হরিনামে পরিণাম রবে কুশলে।
তাপ কর্ম্মবন্ধ ফাঁস আর তাহে অষ্ট পাশ,
ভবসিন্ধু পার বন্ধু হবে কি বলে।

ললিত রাগের প্রাণমাতান আকর্ষণে গ্রামবাসিগণ জাগিতেছেন, একটা মধুর ভাব লইয়া। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের যে আনন্দ জল্পনা চলিতেছিল, আজ সেই আনন্দপ্রভাত সমাগত। সকলেরই প্রাণমন আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রভু বন্ধুসুন্দর নিজ তত্ত্বাবধানে কীর্ত্তনের দল সাজাইতে নিযুক্ত হইয়াছেন। সাধ হইয়াছে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধারায় সাতটি সম্প্রদায়ে চতুর্দ্দশ মর্দ্দলনে নগর সংকীর্ত্তন করাইবেন।

প্রত্যেক দলে দুইখানি মৃদঙ্গ, চারি জোড়া করতাল, একটি বড় ঝাঁজ, একটি বড় কাঁসর থাকিবে এবং মূল কীর্ত্তনীয়া সহ পঞ্চাশ জন গায়ক থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত সমাগত ভক্তগণের মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা হইবে করতাল লইয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিতে পারিবেন। অগ্রে আশা সোটা, নানা বর্ণের পতাকা ও দুইজন ভক্তের শিরে দুইটি তুলসীর টব চলিবেন। এইমত সাতটি সম্প্রদায় হইল। বন্ধু স্বয়ং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইচ্ছামত গতাগতি করিবেন। কোন্ দলে কি নাম গীত হইবেন, তাহাও বন্ধুসুন্দর স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সকলের বাছা বাছা গায়ক বাদক লইয়া প্রথম দল সর্ব্বাগ্রে চলিলেন, তাহারা গাহিতেছেন,—

ঐ ছাখ, হরি হরি হরি বলে নাচে গোরা রায়।
সোণার বরণ অঙ্গরে নয়ন জলে ভেসে যায়।
হরিবলে নাচেরে নিমাই,
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই,
সঙ্গে রঙ্গে প্রেমতরঙ্গে,
সঙ্গীগণ নাচে গায়।
নিত্যানন্দ ছাড়ে হুহুঙ্কার,
বহিল প্রেমের বন্যা খরতর ধার,
গলবাসে গদভাষে
পতিতে প্রেমবিলায়।
মহারোলে মাতিল সংসার,
হরিনাম অবিরাম আনন্দ অপার,
বন্ধুভনে ভক্তগণে
প্রেম বরষিয়া যায়।

গানের সঙ্গে সঙ্গে লীলা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। সকলেই যেন দেখিতে লাগিলেন "সোণার বরণ" গোরারায় নয়নজলে ভাসিয়া হরিব'লে নাচিয়া চলিয়াছেন। আর তাঁহার "বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।" নিতাইচাঁদের হুহুঙ্কারে "প্রেমের বন্যা" বহিতেছে। ভক্তগণ "প্রেম বরষিয়া" চলিতেছেন "মহারোলে" সর্ব্ব সংসার মাতিয়া উঠিতেছে।

তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বিতীয় সম্প্রদায় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া গাহিতেছেন,—

সবে তালে তালে খোল করতালে কর হরিগুণ গান।
ভকতির বশে মজ প্রেম রসে জুড়াবে তাপিত প্রাণ।
বল প্রাণভরে হরে কৃষ্ণ হরে রাধে রাধে জয় রাধে।
গাও অবিরাম রাম হরে রাম বিরাম পাইবে সাধে॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ চরণারবিন্দ ভজরে ভজরে মন।
যাবে মায়া ধন্ধ হবেরে আনন্দ ঘুচিবে ভববন্ধন॥
সবে ভাবে ভুলে দুটি বাহু তুলে কর হরি সংকীর্ত্তন।
জগদ্বন্ধু বলে তবে কুতূহলে এড়াবি রবিনন্দন।

"ভকতির বশে" "প্রেমরসে" মজিয়া খোল করতালের তালে তালে প্রাণ ভরিয়া ভাবে ভুলিয়া দুই বাহু তুলিয়া ভক্তগণ পরম উল্লাসে এই গান গাহিয়া চলিয়াছেন। পদের উপদেশগুলি কীর্ত্তনের মাঝে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহাদের পশ্চাতে আসিতেছেন, তৃতীয় দল। তাঁহারা উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে গাহিতেছেন,—

শ্রীঅলোকরঞ্জন সরকার

"নগরবাসী পুরুষ নারী
ভজ নিতাই গৌর হরি"

তাঁহাদের ডাক শুনিয়াই যেন দেশ দেশান্তরের গ্রাম গ্রামান্তরের সহর নগর পল্লীর পুরুষ নারী "নিতাই গৌর হরি" ভজিবার লোভে উধাত্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের পিছনে আসিতেছেন, চতুর্থ দল। তাঁহারা তুঙ্গ তুমুল নর্ত্তনে প্রেম রোলে গাহিতেছেন, সেই পূর্ব্বোল্লিখিত—

গাওরে আনন্দ ভরে হরে কৃষ্ণ নাম।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বল অবিরাম॥

তাঁহাদের অনুগমন করিতেছেন, পঞ্চম সম্প্রদায়। তাঁহারা হরেকৃষ্ণ নামের প্রশস্ত পথে নিতাই গৌরের চন্দ্রিকা লইয়া যেন ব্রজের পঞ্চরসের কুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন। বন্ধুসুন্দর পাঁচটি রসের পাঁচটি নাম দিয়া যে নামবৈজয়ন্তীর মালা গাঁথিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের কণ্ঠে,—

কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
রাধা মাধব রাধিকা নাম॥

মধুর নামের মধুর রোলে মহম্বর ছাইতেছে। তাঁহাদের অনুগমনকারী ষষ্ঠ দল প্রভুবন্ধুর একটি পরম আদরের গান গাহিতেছেন। তাঁহারা যেন দয়াল নিতাইচাঁদের কারুণ্যমাখা ডাক শুনিয়াছেন। তাহাই সকলকে ডাকিয়া শোনাইতেছেন,—

ডাকেরে করুণ স্বরে নিত্যানন্দ রায়।
প্রেম কে নিবি কে নিবি বলে ডাকিতেছে উভরায়॥
বিনা মূলে বিকা'ব, গোরা নিধি মিলা'ব,
হরি বলে বাহু তু'লে কে কোথা রয়েছিস আয়॥
আর চিন্তা নাইরে ভাই, আয় গৌর গুণ গাই,
তোদের ভাগ্যে বিশ্বম্ভর অবতীর্ণ নদীয়ায়॥
ভাই বল হরিবল মোরে কররে শীতল,
হরিবলে বিনামূলে কিনে লহরে আমায়॥
নিতাই ডাকে বারেবার, গেল সকল আঁধার,
প্রভু বন্ধু বলে দীন ব'লে রাখ প্রভু রাঙ্গা পায়॥

সকলের পশ্চাতে সপ্তম সম্প্রদায় বন্ধুর "রসনার ধন" "সর্ব্বতঃ প্রকাশ্য" হরিনাম মন্ত্র আস্বাদন করিয়া চলিয়াছেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মহাকলির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সাতটি বাহিনী সুসজ্জিত হইল। শঙ্খধ্বনি হইল। শিঙ্গা বাজিল। বিউগল বাজিল। কুলবতীগণ উলুধ্বনি করিল। কীর্ত্তনবাহিনী মহারঙ্গে যাত্রা সুরু করিল। চৌদ্দ মাদলের গর্জ্জন, অগণিত করতালের ঝন্ ঝন্, ঝাঁজ শিঙ্গা বিউগলের মিশ্রিত ধ্বনি, শত শত ভক্তের প্রেমস্বরে মিশ্রিত মহারোল। আকাশ বাতাস কাঁপিতে লাগিল। খরতর ধারে প্রেমের বন্যা বহিল। রসের বাদর নামিল। প্রভুবন্ধুর অমিয় ভাষায়—"কাশ্যপী কম্পিল রে বন্যা বাদর।"

পুলকিতা ধরা সে প্রেমসঙ্গমে ভাসিয়া উঠিলেন। ঊর্দ্ধে প্রসন্ন অম্বরে দেবতাগণ মহানন্দে নাচিতে নাচিতে প্রেমের বন্যা দর্শন করিলেন। কোন কোন দেবতা কলির জীবের ভাগ্যকে মনে মনে ঈর্ষা করিলেন। কেহ বা ধন্য ধন্য করিলেন।

———

নগর পরিক্রমণ

পদ্ভ্যাং ভূমে র্দিশো দৃগ্‌ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্ কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥

—শ্রীশুক

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু তখন সর্ব্বজন সমক্ষে অমিয় বাণী ঘোষণা করিলেন। বলিলেন, "হরিনাম এত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিবে, যেন সহস্র হস্ত দূর হইতে শোনা যায়। স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ সবাই উদ্ধারণ প্রয়াসী হ'য়ে চেয়ে আছে। নামই উদ্ধারণ।"

শ্রীমুখের মর্ম্মস্পর্শী বাণী শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরম উল্লাসে নর্ত্তন কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নামের সহিত প্রেমের রোল উঠিল। "জয় শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বোল" "জয় শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ প্রেমানন্দে হরি হরি বোল" প্রভৃতি নানা জয় ধ্বনি উঠিল। ধ্বনির পর ধ্বনি, পুনরায় ধ্বনি। সে ধ্বনি কেবল সহস্র হস্ত দূরত্ব নহে, মহাম্বর ছাইয়া গেল।

বন্ধুসুন্দর কেবল উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। প্রত্যেকটি দলেই "কারুণ্যেক্ষণ" বর্ষণ করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন। খোল করতাল ও প্রেমভক্তিমাখা নামের এমনই রোল উঠিল, যাহাতে সকলে অনুভব করিল স্বয়ং নিতাই গৌর অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর কীর্ত্তনে সাক্ষাৎ উদিত হইয়াছেন। যাঁহারা বুঝিবার, যাঁহারা দেখিবার তাঁহারা বুঝিলেন, দেখিলেন।

কীর্ত্তন এখন আর মর্ত্ত্যলোকের বস্তু নহে। নিত্য-নদীয়ার নিত্য কীর্ত্তনলীলা আজ ফরিদপুরের রাজপথে আবির্ভূত হইয়াছেন।

মধুর মৃদঙ্গ মধুর বাজিতেছে। কখনও আবার একযোগে চতুর্দ্দশ মর্দ্দল মহাভাবে গর্জ্জন করিতেছে। মহারঙ্গে প্রেমরোল উঠিয়াছে। "প্রেমস্বরে প্রাণভরে" ভক্তিগদগদ কণ্ঠে ভক্তগণ গাহিতেছেন। পঞ্চতত্ত্বময় শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর স্বয়ং সাতটি সম্প্রদায়েই ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র বস্ত্রে ঢাকা, যেন একটি তুষারাবৃত স্বর্ণগিরি নৃত্যপরায়ণ হইয়াছেন। রঙ্গে ভঙ্গে নর্ত্তন। হেলন দোলনে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা। নর্ত্তনে হেলনে বন্ধুসুন্দরের শ্রীঅঙ্গের কোন কোন অংশ অনাবৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহাতে বিজলী চমক খেলিতেছে। তাহার ছটা দর্শকের নয়নপথ ধাঁধিয়া দিতেছে। রূপের ঝলকে শ্রীঅঙ্গের সৌরভে শ্রীমুখের মধুর হাস্যে প্রেমভক্তি উদ্বেলিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণকান্দা ধাম হইতে ফরিদপুর সহরাভিমুখে তুমুল নগরকীর্ত্তন বাহির হইল। কোনও দল উদ্দণ্ড নৃত্যসহকারে উন্মাদের মত মাতিয়া সহরপল্লী বনভূমি কাঁপাইয়া চলিয়াছে। কোনও দল বা অতি ধীরে থামিয়া থামিয়া প্রতিটি দ্বারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গানের প্রত্যেকটি অক্ষর স্পষ্ট করিয়া গাহিয়া শুনাইয়া মন্থর পদে পথে অগ্রসর হইতেছে। গ্রামবাসী সহরবাসী নরনারী বালকবৃদ্ধ ধনী মানী সকলে রাজপথে দাঁড়াইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ সে অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতেছে।

কীর্ত্তনের তালে তাহাদের অঙ্গ দুলিতেছে। তাহারা জানেনা যে, তাহারা শুধু দেখিতেছে না, নাচিতেছেও।

"নগর তোরণ বন পথ প্রান্তর
হরিনাম অবিশ্রাম গঙ্গা অম্বর"
(মঙ্গল মঙ্গল রে) (হরিনাম প্রচারণ)
(কৈতব পলায়ন)

উত্তরকালে লিখিত বন্ধুসুন্দরের এই বর্ণনার বীজ উপ্ত হইল। নামের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে গ্রাম দেশ মুখরিত হইল। "পাতক কৈতব" দূর দূরান্তরে চলিয়া গেল। চারিদিক হইতে লোকজন দলে দলে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। কেহ ধূলায় গড়াগড়ি দিল। কেহ নয়ন জলে ভাসিল। কেহ বা ভাববিহ্বল হইয়া পড়িল। দোকানী ফুল বাতাসা ছড়াইল। কুল কামিনীগণ উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি রোল তুলিয়া গগন পবনে নব আন্দোলন জমাইয়া দিল। "কীর্ত্তনানন্দ" একটা শব্দ মাত্র ছিল। আজ ফরিদপুরের লোক তাহা প্রত্যক্ষ করিল। সে আনন্দ কল্লোলে জগজ্জীব শীতল হইল। অন্তরীক্ষে দেবতারা নাচিল। হরিবোল প্রেমরোল। হরিবোল হরিবোল !!

———

বাগ্‌দী পাড়া

ফরিদপুর সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে "মেলার মাঠ।" মেলার মাঠের পার্শ্বে বাগ্‌দী পাড়া। চৌদ্দ মাদল নগর কীর্ত্তন যখন বাগ্‌দী পাড়ার নিকট দিয়া চলিয়াছে, তখন বাগ্‌দীরা পুরুষ নারী ছেলে মেয়ে সকলে ছুটিয়া আসিয়া রাস্তার ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইল। নগ্নদেহ নগ্নপদ কটিমাত্র বস্ত্রে ঢাকা। তাহাও ছিন্ন মলিন শতধা গ্রন্থিল। কাজল কালো গায়ের রঙ্‌। তাও আবার ধূলিকাদা মাখা। সমাজ উদ্যানে অযত্ন অদ্ভুত আগাছার মত। কিন্তু ধরণীমাতার কোলের ছেলে, কোলেই আছে। বিমাতা সভ্যতা মাতৃ অঙ্ক হইতে এখনও ছিনাইয়া লয় নাই। বাগ্‌দীরা সর্ব্বহারা, তবু আনন্দের বোধ আছে, নাচিতে জানে। যাহা সভ্য জগতের মানুষ জানে না।

বিরাট কীর্ত্তনের শোভাযাত্রা দেখিয়া বাগ্‌দী বালক বালিকারা হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল। তাহাতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইল। কীর্ত্তনের সহিত কীর্ত্তনেশ্বর যেন আনন্দোল্লাস দর্শন করিবার জন্যই ধীরে চলিতে লাগিলেন। অথবা, অন্য কোনও অভিসন্ধি আছে। বাগ্‌দী পাড়ার সর্দ্দার রজনী দূর হইতে বন্ধুসুন্দরের রূপের ছটা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। রজনী স্থির দৃষ্টিতে রূপ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইল।

রজনীর বড় ভাগ্য। তাহারই জন্য তীরবেগে ধাবমান কীর্ত্তনের বেগ মন্দীভূত। তাহারই ভাগ্য-গগনে আজ শ্রীবন্ধুচন্দ্র সমুদিত। শ্রীঅঙ্গের আবরণ কতক কীর্ত্তনানন্দে, কতক বা

পবনদেবের উৎপাতে অনেকটা উন্মোচিত হইয়াছে। রজনী দেখিতেছে, কি যে দেখিতেছে সে কেমন করিয়া বলিবে। প্রথমতঃ সরস্বতী মূক, দ্বিতীয়তঃ, মুগ্ধনেত্র বাগযন্ত্রহীন। কিন্তু রজনী যে মাতোয়াল হইয়াছে। মুহূর্ত্তে যে সে ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহাকে যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই সাক্ষ্য দিয়াছে।

রজনী নাচিতেছে। কেন নাচিতেছে, তাহা সে জানে না। সে যদি নিজে নাচিত তবেই সে জানিত কেন সে নাচিতেছে। কি যেন একটা অদৃশ্য শক্তি তাহাকে চালাইতেছে। কি যেন বিপুল উন্মাদনা তাহাকে নাচাইতেছে, নতুবা যমদূতের মত রজনী সর্দ্দারকে নাচান কি সহজ কার্য্য!

প্রভুবন্ধুর নির্দ্দেশমত নগরকীর্ত্তন ফরিদপুর সহর পরিক্রমণ করতঃ পুনরায় ব্রাহ্মণকান্দায় ফিরিল। সর্দ্দার রজনীও সমস্ত পথ কীর্ত্তনের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে ব্রাহ্মণকান্দায় উপনীত হইল। রজনী বুঝিতেছেনা, কিন্তু তাহাকে যাহারা দেখিতেছে তাহারা বুঝিতেছে। রজনীর দুঃখ-রজনী প্রভাত প্রায়।

জয়ধ্বনি

নগর পরিক্রমণে প্রায় তিন চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইল। ব্রাহ্মণকান্দায় ফিরিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর ভক্তবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। সাতদল একাকার হইয়া গেল। "কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম। রাধামাধব রাধিকা নাম।" রোল উঠিল। প্রভুবন্ধু নিজ গৃহের পিড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলের প্রতি কিয়ৎক্ষণ কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিলেন। পরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শেষ জয়ধ্বনি দিতে দিতে কীর্ত্তন আবার তুমুলভাবে লাগিয়া উঠিল। বৃদ্ধ ঈশ্বর মাষ্টার দধি হলুদের হাড়ি মাথায় লইয়া শিশুর মত নাচিতে লাগিলেন। প্রেমের ভাণ্ড ধূলায় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেলে, সকলে তাহাতে অবলুণ্ঠন করিতে করিতে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কলসী কলসী জলে আঙ্গিনার ধূলি কর্দ্দমময় হইয়া গেল। সকলে কর্দ্দমভূষিত দেহে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বড় করতাল কাঁসরের শব্দে কানে তালা লাগিয়া গেল। বন্ধুসুন্দর নিজ গৃহের গবাক্ষ হইতে এ দৃশ্য দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে হাতে তালি দিতে লাগিলেন।

অতঃপর প্রেমধ্বনি দিয়া সকলে সরসী সলিলে স্নানার্থ অবগাহন করিলেন। স্নানের উল্লাসে বালক বৃদ্ধের ভেদ তিরোহিত হইল। সকলেই চঞ্চলের শিরোমণি সাজিয়া

কাদা ছিটা-ছিটি, জল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন। কে কার কাঁধে উঠিল, কে কার পা ধরিয়া টানিল, তাহার নির্ণয় থাকিল না। দুঃখীরামের সঙ্গে প্রতাপের ঝগড়া বাঁধিয়া গেল। ঘোষমশায় ভুঞামশার কোন্দল দেখিয়া সকলে কোলাহল করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে সকলে শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির-দুয়ারে প্রণত হইয়া আম্র বৃক্ষের ছায়াতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে শুইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

তৎপর বিরাট মহোৎসব বসিল। অপর্য্যাপ্ত মহাপ্রসাদ বিতরিত হইল। নানা আনন্দ ধ্বনির মধ্যে শতশত নরনারী ভক্তিপ্লুতচিত্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিল। মহোৎসবের মধুময় আনন্দ স্মৃতি লইয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই ভাবে পর পর কয়েক বৎসর বন্ধুসুন্দর ব্রাহ্মণকান্দা হইতে চৌদ্দমাদল নগরকীর্ত্তন বাহির করিয়াছিলেন। যে রজনীর আজ সবেমাত্র জীবন প্রভাত, উত্তর কালে তিনিই হইয়াছিলেন বন্ধুহরির প্রবর্ত্তিত শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের প্রধান গায়ক ও উদ্যোক্তা।

মহোৎসবের প্রসাদ লইয়া, প্রভুবন্ধুর মুখখানি আর একটী-বার দর্শন করিয়া, রাঙা চরণে আর একটীবার প্রণত হইয়া রজনী গৃহগমনে উদ্যোগী হইল। তখন প্রেম-ঘন-বিগ্রহ শ্রীবন্ধু-সুন্দর কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিলেন। নীরব দৃষ্টি মাত্র, কিন্তু রজনী আনন্দে আত্মহারা। তাহার মনে হইল, এতক্ষণ সে যত আনন্দ পাইয়াছে, সকলে মিলিয়া যত আনন্দ করিয়াছে, তাহার চরম ও পরম ফল ঐ হৃদয়স্পর্শী দৃষ্টিখানির

মধ্যে একত্রে বর্ত্তমান। সে চাহনী একটি মহানিধি। নয়ন পথে তাহা অর্জ্জন করিয়া রজনী নিজ বক্ষঃ সম্পুটে উহা ধারণ করিল। ভরাবুকে গৃহে ফিরিল।

হিন্দুসমাজ ও বুনা জাতি

"সমাজের বাঁধ ভেঙ্গে দেবো"

—বন্ধুবাণী

উদার হিন্দুধর্ম্মের দ্রষ্টা ঋষি বিশ্বাস করেন যে, দ্রষ্টা এক অদ্বিতীয় জগদীশ্বর, এক হইয়াও অনন্ত বিশ্বে বহুরূপে প্রকাশিত আছেন। তিনি নিরংশ হইয়াও মায়াশক্তি প্রভাবে নানাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। তত্ত্বতঃ এক হইলেও তিনি নানারূপে প্রকাশিত রহিয়া সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়াদি কার্য্য সাধন করিতেছেন। ক্ষুদ্র জীব সর্ব্বদাই দুঃখী। ক্ষুদ্র বলিয়াই সে দুঃখী; তাহাকে বড় হইতে হইবে। পরম বস্তুর সান্নিধ্য ছাড়া বড় হইবার আর অন্য উপায় নাই। উপাসনাই সেই সান্নিধ্য লাভের পন্থা।

উপাসনা মানস ব্যাপার, অথচ উপাস্য ব্রহ্মবস্তু মনোময় ভূমির অতীত সত্তা। মনের অতীত বস্তুকে মনের মধ্যে আনিতে প্রতীকের প্রয়োজন। বস্তুতঃ, প্রতীক ছাড়া উপাসনাই হয় না। মনোবিজ্ঞানীরা জানেন, প্রতীক ছাড়া উপাসনা সোনার পাথর বাটীর মত। পরম পুরুষের বহু রূপের বহু প্রতীক হইতে পারে। এক অদ্বিতীয় সত্তার অগণিত শক্তির অগণিত প্রকারের

প্রতীক হইতে পারে। বহু শক্তি ও বহু প্রতীকের মধ্যদিয়া একই পরাৎপর তত্ত্ব দর্শন করিবার যোগ্যতাই "জ্ঞান" পদবাচ্য। প্রতীকোপাসনার পাশাপাশি তাই জ্ঞানানুশীলন অপরিহার্য্য। জ্ঞানাভাবে বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী।

কালধর্ম্ম প্রভাবে পরাধীনতার চাপে জাতি ও ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইলেই প্রকৃত, জ্ঞান চর্চ্চার দুয়ারে অর্গল পড়িল। বহুত্বের মাঝে একত্ব, মানুষ ভুলিয়া গেল। সমাজ সমদৃষ্টি হারাইয়া ফেলিল। স্মৃতি শাস্ত্রের গণ্ডী গড়িয়া উঠিল। বিধি নিষেধের অগণিত দেউলে দুর্ব্বল সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তণ্ডুলের উপরিভাগে তুষ আছে। বীজ রক্ষা ও শস্য উৎপাদনের জন্য ইহার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু জীবনধারণের জন্য চাউল হইতে তুষ পৃথক করিতেই হইবে। রক্ষণশীলেরা এই সহজ সত্য অস্বীকার করিল। ধর্ম্মের মর্ম্ম ভুলিয়া শুধু বর্ম্ম লইয়া সবাই ব্যস্ত-বাগীশ সাজিল। বিভিন্ন আচারশীল মানুষকে নিজগৃহে গ্রহণ করিবার শক্তি সমাজ হারাইয়া ফেলিল। উপেক্ষা, ঘৃণা, দলাদলি ও বর্জ্জন ইহাই পুঁজি থাকিল। উদারতা পরিণামে হীন সংকীর্ণতায় পর্য্যবসিত হইল।

আজ রুদ্ধ দুয়ারের অর্গল ভাঙ্গিয়া পরকে আপন করিয়া নব চেতনার উদ্বোধন করিবে কে ? সে মন্ত্র, সে বীজ কোথায় ? শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রেমমন্ত্রে পূত করিয়া সে একত্বের বীজ বপন করিয়াছিলেন। তাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ক্ষেত্র আবার বিদেশী শিক্ষার আগাছায় পরগাছায় ভরিয়া গিয়াছে।

নবগোর প্রভু বন্ধুহরি সেই ক্ষেত্রের আগাছা ঘুচাইয়া জল সিঞ্চন আরম্ভ করিলেন।

ফরিদপুর, ঢাকা, যশোহর সহরের উপান্তে ও বহু গ্রামে কয়েক সহস্র বাগ্‌দী বাস করিত। খৃষ্টান পাদ্রীগণ তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অত্যধিক চেষ্টা চালাইতে ছিলেন। এই বাগ্‌দীরা মূলতঃ ভীল কোল ও সাঁওতাল বংশধর। এতদ্দেশে যখন নীলের চাষ-আবাদ হইত তখন ঐ কার্য্যের জন্য নীলকুঠিয়ালরা সাঁওতাল পরগণা ও অন্যান্য পার্ব্বত্যদেশ হইতে বন্যজাতীয় কুলি দলে দলে আমদানী করিত। কুঠিয়ালরা তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইত। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নীলদর্পণ প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে সেই অত্যাচার-কাহিনী অবগত হওয়া যায়।

শত অত্যাচারের মধ্যেও যতদিন নীলের আবাদ ছিল, ততদিন বাগ্‌দীরা দুইটি খাইতে পাইত। রাসায়নিক উপায়ে নীল প্রস্তুত আরম্ভ হইলে নীলের চাষ উঠিয়া গেল। তখন তাহাদের আর্থিক বিপর্য্যয়ও শোচনীয় আকার ধারণ করিল। তাহারা বড় বড় সহরের প্রান্তে প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল। রাস্তা বাঁধা, ডোয়া বাঁধা, সুরকী ভাঙ্গা, শূকর মারা, মারামারি করা এই সকল কার্য্য তাহারা জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া লইল।

হিন্দু সমাজে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত যাহারা, ইহারা তাহাদেরও উপেক্ষিত। ইহারা অস্পৃশ্যদেরও অস্পৃশ্য। কি সামাজিক কি অর্থনৈতিক, কি নৈতিক সর্ব্ববিষয়েই ইহারা

হীনাতিহীন। বিবাহ প্রথা নাই বলিলেও চলে। কাঁচা মাংস পোড়াইয়া খাওয়া ব্যতীত পাকপ্রণালী প্রবর্ত্তিত নাই। ইহাই বাগ্‌দী জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। চলিত কথায় ইহাদিগকে সবাই বলে বুনা। ফরিদপুর ঢোল সমুদ্রের কিনারে কিনারে, মেলায় মাঠের আশেপাশে এই বুনারা কয়েক সহস্র লোক বাস করে। তাহাদের মোড়ল রজনী সর্দ্দার।

রজনী সর্দ্দার

লম্বা লম্বা চুল, লম্বা লম্বা দাড়ি, বড় বড় গোঁফ, কপালে রাঙ্গা সিন্দুরের ফোঁটা, বৃহৎ চক্ষু, জবা ফুলের মত রক্ত বর্ণ। আকৃতি ভয়াবহ, প্রকৃতিও অত্যুগ্র। নাম রজনী সর্দ্দার। লাঠি খেলা, শরকী খেলা, তীর ধনুকের খেলা, এসব বিষয়ে রজনী ওস্তাদ। উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিয়া রজনী যখন লম্বা বাঁশের তৈলাক্ত লাঠিখানা দুই হাতে কপালের সম্মুখে তুলিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার মাথার বাবরির চুলগুলি খাড়া হইয়া উঠে। যে দেখে, সে-ই ভয়ে পলায়ন করে। কেবল মানুষ নয়, হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত তাহাকে ডরায়। ঘরে ছেলে মেয়ে কাঁদিতেছে, মায়েরা বলে, "ঐ রজনী সর্দ্দার আস্‌ছে" অমনি কাঁদা ছেলেরা গম্ভীর হইয়া ভয়ে মায়ের বুকে মাথা লুকায়।

গায়ের বর্ণ চাঁদহীন-রজনীর মত হইলেও, রজনীর গুণ অনেক। তন্ত্র মন্ত্র ফুঁ ফাঁ অনেক কিছু সে জানে। তাবিজ, কবচ, জল-পড়া, ধূলি-পড়া, সাপের ঔষধ, মুষ্টিযোগ, রজনীর

অনেক কিছু অধিগত আছে। নরনারী রজনীর কাছে অনেক প্রকার উপকার পায়। কেবল ফরিদপুর সহরে নহে, সমস্ত জেলায় রজনী সকলের পরিচিত। নানা জনে নানা প্রয়োজনে রজনীকে ডাকে। কিন্তু, নিঃসঙ্কোচে কাহারও ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া বসিবার অধিকার রজনীর নাই।

রজনী হিন্দুর দেবদেবীকে ভক্তি করে। গো ব্রাহ্মণ সাধু বৈষ্ণবকে শ্রদ্ধা করে। নানা প্রকারে মানুষের উপকার করে। কিন্তু হিন্দু সমাজ তাহাকে, তাহার জাতিকে মানুষের অধিকার-টুকু দেয় না। রজনীর জল অচল। তাহাকে বারান্দায় উঠিতে দেখিলে কেহ পানীয় জল সরাইয়া রাখে, কেহ হুঁকার জল ফেলিয়া দেয়, কেহ বা তাহার ছায়া মাড়াইলেও স্নান করিতে যায়। ক্ষৌরকার তাহাকে ক্ষৌরী করে না। রজক তাহার বস্ত্র পরিষ্কার করে না। ব্রাহ্মণ তাহার গায়ের বাতাস এড়াইয়া দূর দিয়া চলে। ৺পূজায় সময় কত ধনীর আদেশ মত কাঁটার আঁচড় সহ্য করিয়া সে রাশি রাশি বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া আনে কিন্তু কোনও মন্দিরে মাথা প্রবেশ করাইবার অধিকার তাহার নাই। কোন চাঁদোয়ার নীচ দিয়া হাটিবার আগে তাহাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়। হিন্দুদের বাড়ীতে তাহারা নানা কাজে আসে যায় কিন্তু বুনাদের প্রতি সমাজের অনাদর, অপমান, অত্যাচার রজনীকে মর্ম্মান্তিক পীড়া দেয়। পেটে খাবার নাই। চালে খড় নাই। এক হাত মাত্র উঁচু ভিটার উপর দিয়া বর্ষাকালে জলের স্রোত বহিয়া যায়। মানুষের সহ্য গুণের একটা সীমা আছেতো!

খৃষ্টান পাদ্রীরা প্রায়ই আসে যায়। বুনাদের দুঃখ দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া মন ভোলান কথা কয়। হিন্দুদের বৈষম্য-মূলক আচরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখায়। তাহাদের তথা-কথিত ক্যাথলিক (উদার) ধর্ম্মের দিকে টানে। পরিত্রাতা যীশুর প্রেমের কথা বলে। এক তো গায়ের চামড়া সাদা, তাহাতে কোট প্যাণ্টালুন পরা। তাহাতে আবার বাইসিকেল চড়িয়া আসে, নূতন নূতন কথা বলে। উপেক্ষা বিষে জর্জ্জরিত বুনারা তাহাদের কথা শোনে। তবু হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান হইতে তাহাদের ইচ্ছা হয় না। হিন্দুরা তাহাদিগকে হিন্দুর কোনই অধিকার দেয় না। হিন্দুধর্ম্মে কোনও প্রকারে তাহাদের একটু বসিবার স্থান নাই। তবু ঐ কাল্পনিক হিন্দুত্ব-টুকুও তাহারা ছাড়িতে চায় না। এতদিন চায় নাই। আজ চাহিয়াছে। আজ সহস্রাধিক বাগ্‌দীসহ রজনী সর্দ্দার খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়াছে। আগামী পরশ্ব পাদ্রীরা আসিবে। সব ঠিক।

উদার উপনিষদের মানব-ধর্ম্ম, অত্যুদার মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম, পুঁথিতে আছে, কাহারও জীবনে নাই। মানুষকে মানুষ বলিবার সৌজন্যটুকুও মানুষ হারাইয়া বসিয়াছে। ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম সহস্র ভেদের গণ্ডী রচনা করিয়া মানুষকে মানুষের পাওনাটুকু দিতে নারাজ। বৈষ্ণব ধর্ম্ম শুষ্ক আচারের অত্যাচারে সাম্প্রদায়িকতায় সংকীর্ণতায়, আউল বাউল সাঁই দরবেশ কর্ত্তাভজা কিশোরীভজা প্রভৃতির চাপে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। সহস্রাধিক বাগ্‌দী খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, এই

সংবাদে হিন্দু সমাজের কেহ একবিন্দু বিচলিত হইল না। বাতব্যাধিগ্রস্ত অসাড় সমাজ দেহে কোথাও একটু বেদনার অনুভূতি জাগিল না। সমস্ত দেশের মধ্যে কেবল একজনের দরদী প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ফরিদপুর সহরতলী ব্রাহ্মণ-কান্দা পল্লীর নবীন তপস্বী নবগৌর শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর।

"প্রভু ডাকিয়াছেন"

"প্রভু, যে রজনী বাগ্‌দী সেদিন চৌদ্দমাদল কীর্ত্তনের সময় ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহারা দলে দলে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।" সকালবেলা দুঃখীরাম ঘোষ এই সংবাদ দিল। দুঃখীরাম ফরিদপুরের বাজারে এই খবরটা পাইয়াছে। খবরটা পাইয়াই তাহার প্রাণটা কেমন কেমন করিয়া উঠিয়াছে। দুঃখী ভাবিয়াছে, যে-ধন পাইয়া সে-নিজে এত সুখী যে, সংসারে আর কিছু বড় ধন চাহিবার আছে বলিয়া সে মনে করে না, সে-হেন ধন দুয়ারের কাছে থাকিতে রজনী, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবে কেন? ব্যথা লইয়া দুঃখী রাত কাটাইয়াছে। প্রভাতে দন্তধাবন করিয়াই সে প্রভুর চরণ সমীপে ছুটিয়াছে। প্রভুর ঘরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া দুঃখীরাম সংবাদটি প্রভুর চরণে নিবেদন করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ, ব্যস্ততা ও বেদনামাখা ছিল। প্রকাশ করিয়া তাহা অনেকখানি হালকা হইল।

সংবাদটি আজই সাধারণ্যে প্রকাশিত হইলেও উহা অন্তর্য্যামী প্রভুর কোনদিনই অজানা ছিল না। রজনীর

খৃষ্টান পাদ্রীরা প্রায়ই আসে যায়। বুনাদের দুঃখ দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া মন ভোলান কথা কয়। হিন্দুদের বৈষম্য-মূলক আচরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখায়। তাহাদের তথা-কথিত ক্যাথলিক (উদার) ধর্ম্মের দিকে টানে। পরিত্রাতা যীশুর প্রেমের কথা বলে। এক তো গায়ের চামড়া সাদা, তাহাতে কোট প্যাণ্টালুন পরা। তাহাতে আবার বাইসিকেল চড়িয়া আসে, নূতন নূতন কথা বলে। উপেক্ষা বিষে জর্জ্জরিত বুনারা তাহাদের কথা শোনে। তবু হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান হইতে তাহাদের ইচ্ছা হয় না। হিন্দুরা তাহাদিগকে হিন্দুর কোনই অধিকার দেয় না। হিন্দুধর্ম্মে কোনও প্রকারে তাহাদের একটু বসিবার স্থান নাই। তবু ঐ কাল্পনিক হিন্দুত্ব-টুকুও তাহারা ছাড়িতে চায় না। এতদিন চায় নাই। আজ চাহিয়াছে। আজ সহস্রাধিক বাগ্‌দীসহ রজনী সর্দ্দার খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়াছে। আগামী পরশ্ব পাদ্রীরা আসিবে। সব ঠিক।

উদার উপনিষদের মানব-ধর্ম্ম, অত্যুদার মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম, পুঁথিতে আছে, কাহারও জীবনে নাই। মানুষকে মানুষ বলিবার সৌজন্যটুকুও মানুষ হারাইয়া বসিয়াছে। ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম সহস্র ভেদের গণ্ডী রচনা করিয়া মানুষকে মানুষের পাওনাটুকু দিতে নারাজ। বৈষ্ণব ধর্ম্ম শুষ্ক আচারের অত্যাচারে সাম্প্রদায়িকতায় সংকীর্ণতায়, আউল বাউল সাঁই দরবেশ কর্ত্তাভজা কিশোরীভজা প্রভৃতির চাপে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। সহস্রাধিক বাগ্‌দী খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, এই

সংবাদে হিন্দু সমাজের কেহ একবিন্দু বিচলিত হইল না। বাতব্যাধিগ্রস্ত অসাড় সমাজ দেহে কোথাও একটু বেদনার অনুভূতি জাগিল না। সমস্ত দেশের মধ্যে কেবল একজনের দরদী প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ফরিদপুর সহরতলী ব্রাহ্মণ-কান্দা পল্লীর নবীন তপস্বী নবগৌর শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর।

"প্রভু ডাকিয়াছেন"

"প্রভু, যে রজনী বাগ্‌দী সেদিন চৌদ্দমাদল কীর্ত্তনের সময় ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহারা দলে দলে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।" সকালবেলা দুঃখীরাম ঘোষ এই সংবাদ দিল। দুঃখারাম ফরিদপুরের বাজারে এই খবরটা পাইয়াছে। খবরটা পাইয়াই তাহার প্রাণটা কেমন কেমন করিয়া উঠিয়াছে। দুঃখী ভাবিয়াছে, যে-ধন পাইয়া সে-নিজে এত সুখী যে, সংসারে আর কিছু বড় ধন চাহিবার আছে বলিয়া সে মনে করে না, সে-হেন ধন দুয়ারের কাছে থাকিতে রজনী, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবে কেন? ব্যথা লইয়া দুঃখী রাত কাটাইয়াছে। প্রভাতে দন্তধাবন করিয়াই সে প্রভুর চরণ সমীপে ছুটিয়াছে। প্রভুর ঘরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া দুঃখীরাম সংবাদটি প্রভুর চরণে নিবেদন করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ, ব্যস্ততা ও বেদনামাখা ছিল। প্রকাশ করিয়া তাহা অনেকখানি হালকা হইল।

সংবাদটি আজই সাধারণ্যে প্রকাশিত হইলেও উহা অন্তর্য্যামী প্রভুর কোনদিনই অজানা ছিল না। রজনীর

জাতিকে রক্ষা করার জন্যই বহু পূর্ব্ব হইতে নগর কীর্ত্তনের আয়োজন। সেই লীলাটীর জন্যই সেদিন প্রেমকীর্ত্তনের সহিত লীলাময় নীরবে কৃপা কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া রজনীর হৃদয়ক্ষেত্র আবাদ করিয়াছেন। সেদিন একসঙ্গে বর্ষণ ও বীজ বপন হইয়া গিয়াছে।

দুঃখীরামের আগ্রহপূর্ণ কথা শুনিয়া ও বেদনাভরা ভাব দেখিয়া দরদী বন্ধু অস্থির ভাবে বলিলেন, "দুঃখী, তুমি এখনই যাও, আমার নাম করিয়া রজনীকে ডাকিয়া আন।" কালবিলম্ব না করিয়া দুঃখীরাম তৎক্ষণাৎ ছুটিলেন। দুঃখী, তোমার দুঃখ সার্থক।

দুঃখীরাম সুদীর্ঘ পুরুষ। লম্বা লম্বা বড় বড় তার হাতপা-গুলি। খুব দ্রুত গতিতে চলিতে অভ্যস্ত। বিপদে পড়িলে মানুষ যেমন বেগে ধাবমান হয়, প্রভুবন্ধুর আদেশ মাথায় লইয়া দুঃখীরামও সেই মত ছুটিয়াছেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বুনা পাড়ায় পৌছিয়া রজনীর ভাঙ্গা কুটীরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "রজনী, তোমাকে প্রভু ব্রাহ্মণকান্দায় ডাকিয়াছেন।"

"প্রভু" "আমাকে" "ব্রাহ্মণকান্দা" ডাকিয়াছেন! বেদ-ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র নহে, সামান্য কয়েকটি শব্দ মাত্র। কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দ রজনীর নিকট সুগভীর তাৎপর্য্য পূর্ণ। তাই প্রত্যেকটি শব্দই রজনীর হৃদয় গঙ্গায় তরঙ্গ তুলিল। পূর্ব্ব দিনের চৌদ্দমাদল রজনী ভুলে নাই। ব্রাহ্মণকান্দার মহোৎসব রজনী ভুলে নাই। মহোৎসবে সে সকল মানুষের সঙ্গে, মানুষের

মত এক পংক্তিতে বসিয়া পরমানন্দে খিচুরী প্রসাদ পাইয়াছিল, তাহাও সে ভুলে নাই। সর্ব্বোপরি কীর্ত্তনের মধ্যে যে সোনার মানুষটি সে দর্শন করিয়াছিল, তাঁহার কথা সে ভুলে নাই। ভুলিবে কেমন করিয়া ?

রজনী লাঠিয়াল, বুনা দলের সর্দ্দার। কিন্তু হইলে কি হইবে, হৃদয়ের মধ্যে একটুখানি কোমল স্থান তাহারও আছে। মানুষ মাত্রেরই থাকে। সেই কোমল স্থানে যে ছবিগুলির ছাপ পড়ে, সে গুলি চিরস্থায়ী হয়, জন্ম জন্মান্তরেও মুছে না। রজনীরও তাই হইয়াছে। কাল সারারাত্রি রজনীর ঘুম হয় নাই। ঘুম আসে আর সব যেন আলোময় হয়। দেখিতে দেখিতে একটা মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়ায়। সোনার মানুষ, করুণ চাহনী। ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, আবার শোয়, আবার ভাবে। ঘুম আসে। আবার সেই আলো, সেই মুখ, কত যেন বেদনামাখা সে মুখ। কত কাতরে যেন বলে, 'রজনী যেওনা' 'রজনী তুমি আমার, আমায় ছাড়িয়া যেওনা।' সনাতন ধর্ম্ম মূর্ত্ত হইয়া যেন রজনীকে আবেদন জানায়। রজনী দেখে, বোঝে, কিন্তু কিছু শোনে না। মূর্ত্তি সে দিনের মতই নির্ব্বাক।

শীতের দীর্ঘরাত্রি এই ভাবে ভাঙ্গা গড়ায় মধ্যে কাটিয়াছে। শেষ রাত্র অবধি রজনী উঠিয়া বসিয়া আছে। আধ ঘুমে আজ জাগরণে স্বপ্নের কথা ভাবিতেছে। বেদনাব কণ্টক মাঝে আনন্দের পদ্ম ফুটিয়া উঠিতেছে। এমন সময় দেবর্ষি নারদের মত দুঃখীরামের উদয়,—দৈববাণী লইয়া—"প্রভু তোমাকে ব্রাহ্মণকান্দা ডাকিয়াছেন।"

'প্রভু' 'ব্রাহ্মণকান্দা' প্রত্যেকটি কথার আড়ালেই রজনীর বুকে দাগ আছে। সেই প্রভু সেই ব্রাহ্মণকান্দায় 'ডাকিয়াছেন', নিজেই ডাকিয়াছেন! আগ্রহ করিয়া ডাকিয়াছেন! লোক পাঠাইয়া ডাকিয়াছেন! ডাকিয়াছেন আমাকে! আমার মত নগণ্য হীনাতিহীন দীনাতিদীন পতিত বুনাকে! ঐ যে একটি ক্ষণ—একটিবার মাত্র আমার দিকে একটুখানি তাকাইয়াছিলেন, তাই আমাকে মনে করিয়া রাখিয়াছেন। সেই কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিখানির মধ্যদিয়া তিনি আমাকে এতখানি নিজের করিয়া লইয়াছেন যে, আজ আবার স্মরণ করিয়া লোক দিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আমাকে তাঁহার কি প্রয়োজন? আমাকে তাঁহার ভাল লাগিয়াছে। আমাকে তিনি ভালবাসিয়াছেন। স্বপ্ন কি তবে সত্য!

রজনী লেখাপড়া জানেনা, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে। ভালবাসা চিনে। ভালবাসিতে জানে। ওটি চেতনাময় আত্মার সহজ স্বভাব কি-না, তাই। রজনী সহজ মানুষ। কৃত্রিমতা নাই। স্কুল কলেজের শিক্ষার তাঁতে বোনা সভ্যতার রঙ্গীন পর্দ্দায় আপনা ঢাকিয়া কৃত্রিম মানুষ সাজিবার সুযোগ তাহার জীবনে হয় নাই। রজনী শূকর মারে বটে, কিন্তু বুকের তলায় স্নেহের স্পন্দনটি স্বভাবিকই আছে। কথাটা বিচিত্র হইতে পারে, কিন্তু মিথ্যা নহে।

মাথার লম্বা বাবরিটাকে ঠিক করিয়া, কোমরে চাঁদর বাঁধিয়া, গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া, লাঠি হস্তে রজনী সর্দ্দার দুঃখীরামের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণকান্দা চলিল। রজনীর বিশাল বক্ষ, প্রশস্ত

ললাট, সুদৃঢ় বাহু সহনশীল নগ্ন চরণ। রজনী মানুষের দৃষ্টি এড়ায় না। কত জন পথে রজনীকে জিজ্ঞাসা করিল, রজনী সকাল বেলা কোথায় চলেছ। রজনী সকলের প্রশ্নেই এক উত্তর দিয়াছে। "প্রভু ডেকেছেন" 'প্রভু ডেকেছেন' এই গৌরবে রজনী গৌরবান্বিত। সে যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে। যেন অনেকখানি বড় হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রত্বের বেদনা-ভার যেন ইতিমধ্যেই অনেকখানি লাঘব হইয়া গিয়াছে। রাঙা রাঙা বড় বড় চক্ষু দুইটি তার আজ ছল ছল।

যাও রজনী, সবচেয়ে বড় যিনি তাঁহার কাছে যাও। ক্ষুদ্রত্ব আর থাকিবেনা। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।

হরিদাস মোহন্ত

"পতিত দেখিয়া কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
করুণ নয়নে চায়"

"রজনী এসেছ" "রজনী এসেছ" বলিতে বলিতে প্রভু বন্ধু-সুন্দর ব্যস্ত-সমস্তভাবে ঘরের বাহির হইলেন। রজনী প্রণাম দিবার পূর্ব্বেই হেমদণ্ড ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া বন্ধুসুন্দর রজনীকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। রজনী আর নাই! তাহার বজ্রদেহ নবনীতের মত গলিয়া গিয়াছে। রজনী কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই যে, অমন একটি অপার্থিব আলিঙ্গন সে জন্মজন্মান্তরেও লাভ করিতে পারিবে।

যাহাদিগকে লোকে প্রভুর অতি প্রিয়জন বলিয়া জানে, তাহারাও কোনদিন্ অমন ভাগ্য লাভ করে নাই। এক পাইয়াছে, পাবনায় হারাণ ক্ষেপা, আর পাইল ব্রাহ্মণকান্দায়, রজনী সর্দ্দার।

দেবাদিদেব দুর্লভ সে স্পর্শ-সুখ-সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়া রজনী তুরীয় ভূমিতে পৌঁছিল। একটা অখণ্ড আনন্দের নিবিড় স্পর্শ তাহার দেহমন আত্মার সর্ব্ববিধ বেদনা চির বিদূরিত করিয়া দিল। রজনীর রজনী প্রভাত হইল। অভিনব দিনের আলোকে জাগিয়া সে কহিল,—

"প্রভু, এ অধমকে ডেকেছেন ?"

"হাঁ ডেকেছি রজনী, তোমরা নাকি খৃষ্টান হবে ?"

"হাঁ প্রভু, কাল পাদ্রীরা আসিবে।"

"কি কারণে তোমরা খৃষ্টান হবে, রজনী ?"

"কি কারণে ? প্রভু আপনিতো সকলই জানেন। আপনাকে আর কি বলিব! হিন্দুর সমাজে আমাদের স্থান নাই। অপমান অত্যাচার আর সহ্য হয় না প্রভু। আমরা হীন বুনা জাতি। এ সমাজে আমাদের স্থান কোথায় ? রজনী কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে।

অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে কণ্ঠ-বীণার তানে ঝঙ্কার তুলিয়া প্রভুবন্ধু কহিলেন, "রজনী, কে বলেছে তোমরা হীন। তোমরা হীন নহ, তোমরা মহান। হরিনাম করিলে তোমরা আরও মহান হইবে। তোমরা বুনা জাতি নহ। তোমরা মানব জাতি। তোমরা আমার অতি প্রিয়। শ্রীহরির দাস তোমরা, ইহাই তোমাদের আসল পরিচয়। রজনী, তুমি সেই নিত্যকালের পরিচয়ে

পরিচিত হও। সকল দুঃখ ঘুচিবে। আজ হইতে তুমি আর রজনী নহ। তুমি হরিদাস। হরিনাম কর। প্রাণ ভরিয়া নিতাই গৌরের, জয় গাও। সগোষ্ঠী ধন্য হও। আজ এইক্ষণ হইতে তোমরা আর বুনা নহ। তোমাদের উপাধি হইবে মোহান্ত।"

রজনী মন্ত্রমুগ্ধবৎ প্রভুবন্ধুর অমৃতময়ী কথা শুনিতেছে। কথা কি প্রাণস্পর্শী, কি আদর মাখা !! এমত দরদ-দেওয়া কথা, এমত আপন-করা কথা এমত সব-ভুলান স্বরূপ-জাগান কথা রজনী তো জীবনে আর কোনও দিন কাহারও নিকট শুনিতে পায় নাই। "তোমরা মানব জাতি, তোমরা আমার অতি প্রিয়" কথা কয়টি রজনীর প্রাণমনে তরঙ্গ তুলিয়াছে। স্পর্শ মাধুর্য্যে সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়াছে, কণ্ঠ মাধুর্য্যে কর্ণযুগল তৃপ্ত হইয়াছে, রূপ মাধুর্য্যে দর্শনেন্দ্রিয় স্নিগ্ধ হইয়াছে, শব্দ মাধুর্য্যে জন্মজন্মান্তরের তাপরাশি চির শীতল হইয়াছে। সর্ব্বসন্তাপশূন্য পরিতৃপ্ত রজনী নবজীবনপ্রভাতে আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়াছে। প্রভুবন্ধু আবার ডাকিলেন,—"হরিদাস"

সজল নয়ন হরিদাস যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছে।

"কাল তুমি সগোষ্ঠী এখানে আসিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসাদ গ্রহণ করিবে। তোমাদের যত লোক আছে, নর নারী বালক বৃদ্ধ সবাইকে লইয়া আসিবে।" এই কথা বলিয়া প্রভুবন্ধু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আত্মহারা হরিদাস কিছু সময় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যেখানে বন্ধুসুন্দর দাঁড়াইয়াছিলেন,

সেই স্থানটিতে একটি গড় হইয়া প্রণাম করিল। লাঠীখানি হাতে লইয়া হরিদাস পূর্ব্বমুখে চলিল। তাহার পায়ের তলায় পুরাণ পৃথিবী, তাহার মাথার উপরের পুরাণ আকাশ, তাহার চারিদিককার পুরাণ বাতাস, তাহার অন্তর রাজ্যের পুরাণ সংশয়—সবই যেন কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজ একটা সম্পূর্ণ নূতন দেশে, সে একজন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ।

হরিদাস, তুমিই প্রকৃত দ্বিজ। তোমার এই দ্বিতীয় জন্ম সার্থক। বন্ধুহরির সাক্ষাৎ করুণালব্ধ তোমার এ দ্বিজত্ব চিরদিন পতিতপাবনী লীলার যশঃ ঘোষণা করিবে। সে ঘোষণা শুনিয়া মিথ্যাভিমানী দ্বিজেরা "আপনাকে ধিক্কার মানিবে।"

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়গুণ যুতারবিন্দনাভ-
পদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।

———

মোহান্ত সম্প্রদায়

"কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয়"

—শ্রীকৃষ্ণ দাস

পাদ্রী পুরোহিতেরা আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। তাহাদের দশ বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা জগদ্বন্ধুসুন্দরের কয়েকটী কথায় ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে বিদায় দিয়া হরিদাস শত শত বালক বালিকা নরনারী সঙ্গে আজ ব্রাহ্মণকান্দায় উপস্থিত হইয়াছে। বন্ধুসুন্দরের আদেশে তুমুল কীর্ত্তনানন্দ হইতেছে। মহামহোৎসব বসিয়াছে। জাতি বর্ণের বিচার নাই। সকলে সমান আসনে, সমান আদরে, পরম তৃপ্তির সহিত মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে। আজ বুনা জাতির নূতন জন্ম হইয়াছে, নূতন নামাকরণ হইবে। তাই এ মহোৎসব।

হরিদাসের গোষ্ঠীর যত লোক উপস্থিত হইয়াছে, বন্ধু-সুন্দরের আদেশে সকলেই কণ্ঠে তুলসীর মালা ধারণ করিল। মাতৃদেবীরাও লইলেন। সখ করিয়া মানুষ যেমন অলঙ্কার পরিধান করে, প্রভুর অমোঘ ইচ্ছাশক্তিতে বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী সকলেরই চিত্তে মালা পরিধান করিবার জন্য সেইরূপ একটা বিপুল আগ্রহ উপস্থিত হইল। সকলের কণ্ঠে নূতন কণ্ঠী এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিল।

শ্রীশ্রীপ্রভু হরিদাসের হাতে করতাল তুলিয়া দিয়া কহিলেন, "এই লও সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ। প্রাণ ভরিয়া জীবন ভরিয়া গৌরহরির নাম কর।" শ্রীমন্ত প্রভৃতি আটজন নূতন করতাল

পাইল। মহিম প্রভৃতি চারজন নূতন মৃদঙ্গ পাইল। প্রতাপ ভৌমিক মহাশয় এই সকল বিতরণ করিলেন এবং পরে প্রভুর ইঙ্গিতে কীর্ত্তনের খাতা লইয়া আসিলেন। বন্ধুসুন্দরের অভিপ্রায় বুঝিয়া মোহান্ত হরিদাস শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতা-নাথের জয় দিয়া "জয় প্রভু জগদ্বন্ধু" বলিয়া গান ধরিল,—

কে রে কাঙালের বেশে যাচিয়া বেড়ায়।
প্রেমদাতা নিতাই বুঝি এসেছে এ নদীয়ায়।
দু'টি বাহু তুলিয়ে, ঐ যায় রে দুলিয়ে,
কাতরে বিনয় ক'রে কলির জীবেরে লওয়ায়।
বলে হরি বল ভাই, ওরে আর চিন্তা নাই,
সকলের দুর্লভ ধন এনেছি কে নিবি আয়।
এমন দয়াল অবতার, ভবে হবার নয়রে আর
আচণ্ডালে লয়ে কোলে নয়ন জলে ভাসে হায়।
প্রভু ছাড়ে হুহুঙ্কার, গেল কালের অধিকার,
গুরু বন্ধু বলে ত্রিভুবন ভাসিল প্রেমের বন্যায়।

কোথা হইতে কীর্ত্তনের শক্তি আসিল, কোথা হইতে মৃদঙ্গ বাদনের শক্তি আসিল, ভাদরের ভরা-নদীর মত, সকল শক্তির মালিক যেন শক্তির উৎস ছুটাইয়া দিয়াছেন। কীর্ত্তনে কি যে আনন্দ হইল তাহা বর্ণনা করিতে স্বয়ং বেদব্যাসও পরাজিত হইবেন। কীর্ত্তনের মাঝে ভাবের ঠাকুর বন্ধুসুন্দর যখন "দুটি বাহু তুলিয়ে" দুলিতে লাগিলেন, যখন হরিদাস শ্রীমন্তকে কোলে লইতে লাগিলেন তখন সকলেই দেখিল ও বুঝিল

সাক্ষাৎ প্রেমদাতা নিতাইচাঁদই "কাতরে বিনয় করে" কলির জীবেরে নাম লওয়াইতে "আচণ্ডালে লয়ে কোলে নয়ন জলে" ভাসমান।

"আচণ্ডালে লয়ে কোলে" পদখানি শত শতবার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিতে গাহিতে হরিদাস আত্মহারা হইয়া পড়িল। তাহার দরবিগলিত নয়ন ধারে ব্রাহ্মণকান্দার ধূলি কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল। প্রভুর আলিঙ্গন-সুখ নয়ন পথে প্রকাশের পথ পাইয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যে তাহাকে স্পর্শ করিল, সেই ভূতাবিষ্টের মত কাঁদিতে লাগিল। পতিতপাবন লীলার এমন মূর্ত্ত অভিনয় সন্দর্শনে ধরিত্রীদেবীও পুলকিত-গাত্রী হইলেন। অন্তরীক্ষে দেবতারাও পুষ্পবর্ষণ করিলেন।

নূতন কণ্ঠীধারিণী জননীরা অগণিত কণ্ঠে উল্লাস ভরে উলুধ্বনি করিলেন। পরম আনন্দ কোলাহলের মধ্যে কীর্ত্তন শেষ হইল অথবা হরিদাসের কীর্ত্তন সবে আরম্ভ হইল। প্রভু-বন্ধু সাদরে কহিলেন, "হরিদাস, আজ হইতে তোমার বংশধর এবং স্বজ্ঞাতি কুটুম্বগণ সকলেই "মোহান্ত সম্প্রদায়" নামে অভিহিত হইবে।"

দেখিতে দেখিতে হরিদাসের সঙ্গ প্রভাবে ও শ্রীশ্রীবন্ধুর পরম কৃপাকর্ষণে শ্রীমন্ত, মহিম, সতীশ, রামপ্রসাদ, রতি, বিজয়, মনোমোহন, বাসু প্রভৃতি বালক ও যুবকগণ বন্ধুর চরণাশ্রয় করিয়া উত্তম মৃদঙ্গবাদক ও সুন্দর কীর্ত্তন গায়ক হইয়া উঠিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু মোহান্ত সম্প্রদায়কে এমনই কৃপাশক্তি দান করিলেন যে, তাহাদের বংশে যে-ই জন্মগ্রহণ করে সে-ই

মৃদঙ্গ বাদন শক্তি ও কীর্ত্তন দক্ষতা যেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীবন্ধুর কৃপার বাতাসে মোহান্ত সম্প্রদায়ের যে রূপান্তর ও ভাবান্তর হইল এবং তদ্দর্শনে অভিজাত সমাজের যে দিব্য দৃষ্টি ফুটিল, তাহা বর্ণনা করিলে প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া বিশ্বাস করিবে কে? যাহারা শূকর মারিত, শূকরের মাংস কাঁচা পোড়াইয়া খাইত, তাহারা গোপীচন্দন তিলক কণ্ঠী ভূষিত হইয়া সাত্ত্বিক আহার বিহারের জয় গান করিতেছে। যাহারা বুনো বলিয়া সমাজে নিতান্ত ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য ছিল, আজ ধনী মানী কুলীন ব্রাহ্মণ তাহাদের চরণ ধূলি কুড়াইয়া ভক্তি শিক্ষা করিতেছে।

কথাটা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। খৃষ্টান মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। স্থানীয় ইতর ভদ্র সকলেই জগদ্বন্ধুর শক্তির কথা বলাবলি করিতে লাগিল। ফরিদপুরের বাহিরে কলিকাতায় এই ঘটনা লইয়া কাগজে লেখা-লেখি হইল। কলিকাতার বাহিরে ভারতের পাদ্রী মহলে এবং ভারতের বাহিরে বিলাতে পর্য্যন্ত এই কথা লইয়া আন্দোলন হইল। সাহেবদের "আবগারী" নামক কাগজে এই লইয়া প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বুনারা মোহান্ত হইয়াছে—ইহা সত্যসত্যই একটা খবর বটে।

বহুকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করিতে আলোর বহুকাল লাগে না। বন্ধুহরির কৃপাসূর্য্যোদয়ে বুনাদের যুগযুগান্তরের মোহ-অন্ধকার নাশ হইয়া গেল। নতুবা কি এমন হয়! দেখুন, তাহাদের কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তন, কি প্রাণস্পর্শী নর্ত্তন, কি মনমাতান

মৃদঙ্গ বাদন। কীর্ত্তনে কি গভীর আর্ত্তি, কি বিপুল তন্ময়তা, কি প্রবল উন্মাদনা! শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত গানে তাহাদের কি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, কি তীব্র অনুরাগ, কি অক্লান্ত পরিশ্রম! ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনি দশঘণ্টা নাচিতেছে, গাহিতেছে, মৃদঙ্গ বাজাইতেছে। ঘর্ম্মে ঘর্ম্মে শুষ্ক মৃত্তিকা কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছে। বস্ত্র ভিজিয়া গুটাইয়া ছিড়িবার উপক্রম, তথাপি শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, মুহূর্ত্তের বিরতি নাই। তাহাদের মরাজাতির মধ্যে যে নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছে, ইহা যেন তাহারই বিকাশ। মোহান্ত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন যে দেখে সে-ই চাহিয়া রয়। যে শোনে সে-ই মুগ্ধ হয়। যাঁহাদের ভাবিবার মত বুদ্ধি আছে তাঁহারা ভাবে, "এ লোহার মানুষগুলি কেমন করিয়া এমনি ভাবে সোনা হইয়া গেল!" যাঁহাদের একটু অনুভব আছে তাঁহারা ধীরে উত্তর করেন, "পরশমণির পরশে।"

অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥

—শ্রীগীতা

বিভাবসু পশ্চিম গগনে ঢলিতেছেন। রাখালগণ গোচারণ করিয়া ধেনুবৎসসহ কোলাহল করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। এমন সময় রসাল মৃদঙ্গ ও করতালের ধ্বনিতে ব্রাহ্মণকান্দার পথঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল। কি অপূর্ব্ব মনমাতান কীর্ত্তন রোল। নরনারী বালক বৃদ্ধ পথের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেল। পথিকের পথচলা বন্ধ হইল। রাখালের গরু তাড়ান বন্ধ হইল। গাভীগণ উৎকর্ণ হইয়া স্থির হইল। কুলবধূগণ কলসী কাঁখে লইয়া অবগুণ্ঠনের আড়াল হইতে তৃষিত চাতকপারা চাহিতে লাগিল।

গোষ্ঠ হইতে নন্দালয়ে প্রত্যাগত নন্দনন্দনের মোহন মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ যেমন তৃষ্ণার্ত্ত দৃষ্টিতে চাহিতেন, বন্ধু-সুন্দরের বৈকালিক নগর কীর্ত্তনের মঙ্গলধ্বনি শুনিয়া ব্রাহ্মণকান্দা গ্রামের আপামর জনসাধারণ তেমনি ভাবে পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ক্ষুধার্ত্ত নয়নের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন।

আজ বন্ধুসুন্দর স্বয়ং কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছেন। প্রত্যহই বাহির হন না। মধ্যে মধ্যে বাহির হন। বাহির হইয়া কীর্ত্তনের মধ্যস্থানে বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় শ্রীমুখখানি মাত্র উন্মুক্ত রাখিয়া নানা ভঙ্গিতে পথ চলিয়া যান। ক্বচিৎ কোনদিন

নিজেই মৃদঙ্গ বাজান। বন্ধুসুন্দরের শ্রীমৃদঙ্গের নাম "সীতানাথ"। অতি সুদর্শন, বৃহৎ মৃদঙ্গ। বিশেষ ফরমাসমতই প্রস্তুত। যেদিন কীর্ত্তনে "সীতানাথ" বাজেন, সেদিন আকাশ বাতাস মাধুরী তরঙ্গে কম্পিত হইতে থাকে। দেবতা গন্ধর্ব্ব কিন্নর সে মৃদঙ্গ ধ্বনি শ্রবণে প্রেমে পুলকিত হন।

আজ কীর্ত্তনের রোল শুনিয়াই অনেকেই বুঝিতেছেন শ্রীবন্ধুর শ্রীহস্তে "সীতানাথ" বাজিতেছেন। সোনালী রংয়ের নামাবলীখানি উত্তরীয় করিয়া নবনীত কোমল অঙ্গ হেলাইয়া অপরূপ নটন ভঙ্গিতে চলিয়া যাইতেছেন। যে দেখিতেছে সে-ই দেখিতেছে। আর কাহাকেও ডাকিয়া দেখাইবার শক্তি নাই। চিত্রপুত্তলিকার মত সকলে পলকহীন নয়নে চাহিয়া আছে। ধেনুগণ গৃহ গমন ভুলিয়া উর্দ্ধপুচ্ছে সে রূপমাধুরী আস্বাদন করিতেছে। রাখাল বালকগণ রূপের ছটায় সব ভুলিয়া যেন দিশাহারা হইয়াছে।

জগৎসুন্দরের হাতের মৃদঙ্গের রোল শুনিয়া দিদি দিগম্বরী ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছেন। পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দিদি বাদনরত জগতের শ্রীমুখ পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। দিদি দেখিতেছেন, অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমাভ সোনালী কিরণ জগদ্বন্ধুর মুখজ্যোতির সঙ্গে মিলিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সূর্য্যমণ্ডল হইতে জগৎসুন্দরের মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত একটা উজ্জ্বল আলোর রেখাপথ সৃষ্টি হইয়াছে। পদ্ম-বান্ধব সূর্য্যদেব যেন তাঁহার কিরণকর প্রসারণ করিয়া বন্ধুসুন্দরের মুখপদ্মের মধু লুটিয়া লইয়া যাইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে সে আলোকমালা নীলবর্ণ জ্যোতিঃ বিস্তার করতঃ দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। কীর্ত্তনমণ্ডলী ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। জয় জয় হরিধ্বনি দিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন শেষ করিলেন। প্রতাপচন্দ্র বন্ধুর স্কন্ধদেশ হইতে "সীতানাথ"কে লইয়া যথাস্থানে রক্ষা করিলেন। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে জগৎসুন্দর শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরের বারান্দায় উপবেশন করিলেন। দেবী দিগম্বরী ব্যস্ত ভাবে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

ব্যজন করিতে করিতে দিদি পুনঃ পুনঃ শ্রীবদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন, "জগতের মুখে কী জ্যোতিই না দেখিলাম। এখন তো ঠিক তেমনটি দেখিতেছি না। তবে কি ওটা কোন জ্যোতিঃ নয়, আমারই চোখের ধাঁ ধাঁ?" "জগৎ তার ছোট ভাইটী" "জগৎ একটা মস্ত বড় কিছু" এই দুইটী বুদ্ধি দেবী দিগম্বরীর মানস-অঙ্গনে অনেক সময়ই লড়াই বাঁধাইয়া দেয়। লড়াই জটিল হইয়া উঠিলে দিদি ছোট ভাইটীকে লইয়াই পলায়ন করেন। মঙ্গল চণ্ডীর ঘটের আগে মাথা কুটিয়া, ঘটের নির্ম্মাল্য জগতের মাথায় দিয়া মঙ্গল কামনা করেন।

প্রেম দেব্যাঃ পরীক্ষার্থ মাগচ্ছন্ত্যন্তরান্তরা।
শক্তিরেষা হরেঃ কিন্তু তয়া দাসীকৃতা ভবেৎ॥

—শ্রীবিশ্বনাথ

শ্রীহরির ঐশ্বর্য্যময়ী শক্তি মাঝে মাঝে প্রেমদেবীর পরীক্ষার জন্য আসেন। কিন্তু পরীক্ষা আর কি করিবেন, নিজেই দাসী হইয়া যান!

গোপাল মিত্র

ব্রাহ্মণকান্দা হইতে পশ্চিমে তিন ক্রোশ দূরে বাকচর গ্রাম। গ্রামখানি বৈশ্য প্রধান, বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। ঐ গ্রামে গোপাল মিত্র মহাশয়ের বাস। মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভাই কানাইলাল বদরপুর গ্রামে বাস করেন। গোপাল মিত্র গ্রামের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। শান্ত নিরীহ স্বভাব। পরের বিপদে বুক পাতিয়া দিয়া উপকার করার জন্য দেশে তাঁহার খুব খ্যাতি। কৃষ্ণকুমার সাহা গোপাল মিত্রের প্রতিবেশী। কৃষ্ণকুমারের ডাক নাম নেচু সা। একদিন মিত্র মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে নেচু সাহাকে সঙ্গে লইয়া বদরপুর প্রাণনাথ দাসের বাড়ী বেড়াইতে আসেন।

প্রাণনাথ দাস মিত্র মহাশয়ের আত্মীয় ও সুহৃদ। মিত্র মহাশয় ও নেচুকে একত্রে পাইয়া প্রাণনাথের বড় আনন্দ হইয়াছে। ইহার বিশেষ কারণও আছে। ঐদিন ফরিদপুরের জমিদার চৌধুরীদের বাড়ীতে হরিলুটের কীর্ত্তন আছে। প্রাণনাথ দাসের তাহাতে নিমন্ত্রণ আছে। তাঁহার নিজের একটি কীর্ত্তনের দল আছে। কিন্তু সেদিন বায়ান দোহারের একটু অসুবিধা ছিল বলিয়া তিনি চিন্তিত ছিলেন। গোপাল মিত্র কৃষ্ণকুমার উভয়েই যে ঐ বিষয় পটু, প্রাণনাথ তাহা জানিতেন। তাই, তাঁহাদের আগমনে প্রাণনাথ নিশ্চিন্ত হইলেন। যথাকালে প্রাণনাথ সদলে পরম উল্লাসে চৌধুরী বাড়ী কীর্ত্তনে গেলেন। কীর্ত্তনে বেশ আনন্দ হইতে লাগিল। গায়কগণ মাতিয়াছেন। শ্রোতৃগণও তন্ময়।

এমন সময়ে কীর্ত্তনস্থলীর সকলে চমকিত হইয়া উঠিলেন। একটা সুস্নিগ্ধ আলোর ছটায় কীর্ত্তন মণ্ডপ উদ্ভাসিত করিয়া একটী ভুবনমোহন গৌরবর্ণ মূর্ত্তি কীর্ত্তনস্থলীর এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অঙ্গে শুভ্র বস্ত্র। অঙ্গের জ্যোতিঃ বস্ত্র ভেদ করিয়াই ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

গ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম করিয়া ছলছল নয়ন দু'টিতে তিনি গায়কদের দিকে চাহিতে লাগিলেন। জমিদার চৌধুরী মহাশয়েরা পরম সম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে বসিবার জন্য সানুনয় নিবেদন জানাইলেন এবং একখানি চেয়ার দিলেন। গৌরবর্ণ যুবা পুরুষটি কিন্তু তাহাতে না বসিয়া, কীর্ত্তনের অদূরে ধূলার উপরেই বসিয়া পড়িলেন এবং তন্ময় হইয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে তেজোময় যুবা পুরুষ কোথায় চলিয়া গেলেন। যাঁহারা চিনিলেন না, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ইনি কে?" একজন উত্তর করিলেন, "ইনি প্রভু জগদ্বন্ধু, পরম সাধু মহাপুরুষ। ব্রাহ্মণকান্দার চক্রবর্ত্তী বাড়ীর ছেলে। ইনি কীর্ত্তন লইয়াই থাকেন। বোধ হয়, কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়াই এখানে আসিয়াছিলেন।"

একটা পরমানন্দের আস্বাদন লইয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। গোপাল মিত্র মহাশয় আর চলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে এমন একটা অননুভূত-পূর্ব্ব ছাপ পড়িয়া গিয়াছে যে, কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। মহাজনের সেই অমৃতময়ী গীতিকা তাঁহার

জিহ্বায় আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিল। তিনি মৃদুস্বরে গাহিতে লাগিলেন,—

"কি রূপ হেরিনু মধুর মূরতি
পীরিতি রসের সার,
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার।"

"যত গান গাইতে পার"

মিত্র গোপলের ভাল নিদ্রা হয় নাই। সারারাত্রি সেই মূর্ত্তিখানি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অতি প্রত্যূষেই নিদ্রা-জড়িমায় শুনিতেছেন—পথে কাহারা অতি মধুর প্রভাতী টহল কীর্ত্তন করিতেছেন। মিত্র মহাশয় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া কীর্ত্তনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কী আশ্চর্য্য! কীর্ত্তনের মধ্যস্থলে সেই ভুবনমোহন দেবতা! অর্দ্ধাবৃত অঙ্গে চিত্ত-বিনোদিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। কি সুন্দর রূপ! মৃদঙ্গখানি ধরিবার কি অপরূপ ভঙ্গী! কি অদ্ভুত বাদনশৈলী! কি মনপ্রাণহারী নর্ত্তনকলা! মিত্র গোপাল যেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না—তিনি কি এখনও নিদ্রিত? স্বপ্নেই কি সেই স্বপ্ন-দেবতার দর্শন করিতেছেন? নতুবা, জাগ্রতের দৃশ্যমান জগতে কি এমন বস্তুর সত্তা কুত্রাপি সম্ভব?

কীর্ত্তন ক্রমে বদরপুর রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী পৌঁছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে কুলাধিদেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দজী প্রতিষ্ঠিত আছেন। গোবিন্দজীর মন্দির কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিয়া বন্ধুসুন্দর মৃদঙ্গে মান দিলেন। প্রভাতী কীর্ত্তন শেষ করিবার ইঙ্গিত বুঝিয়া ভক্তগণ নূতন গান ধরিলেন। ঈশ্বর মাষ্টার আগ-দোহারে গানের মুখ ধরিলেন,—

"এস এস নবদ্বীপ রায়
দীনজন ডাক্‌ছে হে তোমায়।"

বন্ধুসুন্দর মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। যেন এক সঙ্গে পাঁচখানি মৃদঙ্গের রোল উঠিতেছে। সীতানাথসহ নিতাইচাঁদ যেন সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের লহর খেলিতেছে। মিত্র মহাশয় বিশ্বজগৎ ভুলিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ উপবেশন করিলেন। বন্ধুসুন্দর মধ্যস্থলে বসিলেন। প্রিয়গণ চাঁদ ঘিরিয়া তারার মালার মত চারিদিকে বসিলেন। বন্ধুসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কানাই মিত্র এখানে আছে কি?"

কণ্ঠস্বরে কি মাধুরী! সে মাধুরীমুগ্ধ মিত্র গোপাল বলিলেন, "প্রভু, কানাই মিত্র ত এখানে নাই, তাকে কেন?"

প্রভু বলিলেন,—"সে খোলখানা বাজালে ওরা আর একটি নাম কর্‌তো।" এই কথা শুনিয়া মিত্র মহাশয় তখন নিজেই বাজাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বড় আদরে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি খোল বাজাইতে পার?"

নেচু উত্তর করিলেন, "প্রভু, ইনি কানাই মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল মিত্র, বাড়ী বাকচর। খুব ভাল মৃদঙ্গ বাজাইতে পারেন। কানাই ইঁহার কাছেই মৃদঙ্গ শিক্ষা করিয়াছে।" মিত্র মহাশয় তখন মৃদঙ্গ লইতে হস্ত প্রসারণ করিতেই, বন্ধুসুন্দর মধুরস্বরে পরম স্নেহে বলিলেন,—

"গোপাল, এই খোলে যে নেওর আছে, ওটি সুতোর। আমি গলায় দিয়েছি। ওটি তোমার গলায় দেওয়া উচিত হয় না। তুমি একখানা পৃথক কাপড় বেঁধে নাও।"

প্রভুর কথায় মুগ্ধ হইয়া মিত্র মহাশয় অনুমতি চাহিবার সুরে বলিলেন, "প্রভু, আমি তবে বসে' বসে' বাজাই, ইঁহারাও বসে' বসে' কীর্ত্তন করুন।" প্রভু সম্মতি দিলেন।

মিত্র মহাশয় খোলখানি লইবার সময় দেখিলেন, বন্ধুসুন্দরের চম্পক-কলিকা-সদৃশ অঙ্গুলিগুলি জবাফুলের রং ধারণ করিয়াছে। মৃদঙ্গ বাদনে বন্ধুগোপালের কষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া মিত্র গোপালের প্রাণটি কাঁদিয়া উঠিল। ঈশ্বর মাষ্টার গান ধরিলেন। নিবারণ সাধু প্রভৃতি পিছনে গাহিলেন। মিত্র মহাশয় মৃদঙ্গ বাদন সুরু করিলেন,—

"ভজ নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ
যদি যাও গোকুল বৃন্দাবন।"

গানে এত আকর্ষণ মিত্র মহাশয় জীবনে কখনও অনুভব করেন নাই। পরম উল্লাসে তিনি মৃদঙ্গ বাজাইলেন। ফিরিয়া ফিরিয়া জমাট দিয়া আসর কাঁপাইয়া তুলিলেন। ভাবের ঠাকুর

বন্ধুসুন্দর গানের তালে তালে, দুলিয়া দুলিয়া, দুলিয়া দুলিয়া আবিষ্টভাবে কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। মিত্র মহাশয়ের মনে হইতে লাগিল, কীর্ত্তনানন্দের পরিপূর্ণ আস্বাদন যেন প্রভুর মাঝে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। আনন্দের এমন আস্বাদক তিনি পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই।

কীর্ত্তনান্তে মিত্র মহাশয় নিবারণ সাধুকে বলিলেন, "গান দুইটি আমাকে লিখিয়া দিবেন।" নিবারণের নিকট হইতে উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই বন্ধুসুন্দর কহিলেন,—

"তুমি কি গান গাহিতেও পার?"

"প্রভু, আমার নিজের কীর্ত্তনের দল আছে।"

"কীর্ত্তনের দল আছে! তবে তুমি দু'একটি গান নেবে কেন? বৈকালে ব্রাহ্মণকান্দা যেও, তুমি যত গান গাইতে পার, আমি তত গান রচনা করিয়া দিব।"

———

বাকচরের জাগরণ

অপরাহ্ন বেলা। মিত্রমহাশয় ও নেচু সা প্রাণনাথ দাস মহাশয়ের বাড়ী আহারাদি সমাপনান্তে বিশ্রাম করিয়া ব্রাহ্মণ-কান্দা আসিতেছেন। মিত্র মহাশয়কে আসিতে দেখিয়াই বন্ধুসুন্দর বলিয়া উঠিলেন, "গোপাল এসেছ, গোপাল এসেছ, এস, এই ঘরে বস।" এত অল্প সময়ের মধ্যেই যে মানুষকে কেহ এত আপন করিয়া লইতে পারে ইহা মানুষের কল্পনাতীত। স্নেহময় ব্যবহারে মুগ্ধ মিত্রমহাশয় নেচুর সঙ্গে বন্ধুর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া মিত্র মহাশয় যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি অতীব বিস্মিত হইলেন। অতি কঠিন বাঁশের তালাইয়ের উপর কুসুমাতিকোমল শ্রীঅঙ্গখানি এলাইয়া দিয়া বন্ধুসুন্দর শায়ীত আছেন। অই নবনীত কোমল দেহের এ হেন কঠোর শয্যা! মিত্র মহাশয় একেবারে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নয়নযুগল তাঁর এই অবসরে সে সাক্ষাৎ অনন্ত-শায়ীর রূপমাধুরী পানে ভরপূর হইতে লাগিল।

"নিবারণ, গোপালকে গান লি'খে দাও।" প্রভুর আদেশে নিবারণ "এস এস নবদ্বীপ রায়," "ভজ নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ" ইত্যাদি চার পাঁচটি গান লিখিয়া দিলেন। বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "গোপাল! এই সব গান তুমি নিজে গাহিবে, অপরকে দিয়া গাওয়াইবে। গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তনের দল বাঁধিয়া দিবে। কীর্ত্তন মঙ্গলের সদা চেষ্টা পাইবে।" প্রভুর আদেশ শিরোধারণ করিয়া

আনন্দে আত্মহারা মিত্র মহাশয় বিশ্বসংসার মধুময় দেখিতে লাগিলেন। সে কারুণ্যামৃত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মিত্র মহাশয়ের আর যেন বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সামর্থ্য নাই। এমন সোনার ঠাকুর ছাড়িয়া মন যাইতে চায় না। অতিকষ্টে অধিক রাত্রে বাকচর যাত্রা করিলেন। পরদিন সকালে গ্রামের নিজ-জনদের ডাকিয়া ব্রাহ্মণকান্দায় যে অমূল্য-ধন দর্শন করিয়া আসিয়াছেন তাঁহার সন্দেশ দিলেন। পরমাগ্রহের সহিত একতান চিত্তে মিত্র মহাশয়ের মুখে বর্ণিত সে শ্রোত্র-মনোভিরাম কাহিনী সকলে শ্রবণ করিলেন। তারপর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

অভিনব কীর্ত্তনের পদ, অভিনব সুরতাল, নবানুরাগে মিত্র মহাশয়ের কণ্ঠও আজ অভিনব। এক একটী পদ বারবার বলিয়াও যেন তৃপ্তি হয় না। প্রত্যেক অক্ষরে অফুরন্ত মধু। ভক্ত ভ্রমরের প্রাণঢালা আর্ত্তিময় ভাবের প্রবাহে সে মধু অবিশ্রান্ত ধারে ক্ষরিত হইয়া বাকচরবাসিদের ভাসাইয়া দিল। এমন গান যাঁহার রচনা তাঁহাকে দর্শন করিতেই হইবে। মিত্র মহাশয় যাঁহার রূপ-মাধুর্য্যে ডুবিয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার ঐকান্তিকী লালসা বাকচরবাসী সকলেরই প্রাণে জাগিয়া উঠিল। লালসা যখন জাগিয়াছে, দর্শন তখন নিশ্চয়ই মিলিবে।

"তত্রলৌল্যমপি মূল্যমেকলম্।"

বাকচর পদার্পণ

"বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশৎ গীতকীর্ত্তিঃ"

—শ্রীশুক

মাঘ মাস। বাঙ্গালা বারশত সাতানব্বই সাল। কাহার যেন আগমন প্রতীক্ষায় বাকচর পল্লীখানি আজ বাসকসজ্জা-নায়িকার মত সাজিয়াছে। পল্লীর চারিদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর। সরিষা কলাই ইত্যাদি রবিশস্যের শেজ পাতিয়াছে। নারিকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি মাথা তুলিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় উৎকণ্ঠিতার মত পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। বেতের ঝোপ, আমের বাগান, বনলতা বনফুল, সবাই মিলিয়া কুঞ্জ সাজাইয়াছে। মাঠের আইল ও গ্রামের আঁকা বাঁকা পথ ব্যাকুল নায়িকার বিন্যস্তবেণীর মত শোভা পাইতেছে। গ্রামের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র নদীটী চিত্তভূমির আশা-নদীর মত উদ্বেগের ঝরণায় পুষ্ট হইয়া বহিয়া চলিয়াছে।

সেদিন হাটবার। রবি পাটে বসিয়াছেন। পাণের ঝাঁকা, ধানের ডালা মাথায়, তরিতরকারীর মোট কান্ধে, তেলের বোতল হাতে, সারি সারি লোক পথে চলিয়াছে। কলসী কাঁখে কুলবতীগণ নদীর ঘাটে জল আনিতে যাইতেছে। এমন সময় গ্রামময় রটনা হইয়া গেল,—কে একটা লোক একটা সুন্দরী বউ ঘরের বাহির করিয়া আনিয়াছে। গোপাল মিত্র মহাশয় হাট করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার কাণেও কথাটা পৌঁছাইল। তিনি আরও শুনিলেন, বৌটাকে নাকি তাঁরই বাড়ীর ৺কালীর ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মিত্র মহাশয় তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ফিরিলেন। মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখেই ৺কালী-মাতার মন্দির। ওখানে প্রতি বৎসর জাঁকজমকে বারোয়ারী পূজা হয়। পূজার পর বারমাস মায়ের মূর্ত্তি বিরাজমান থাকেন, নিত্য পূজা হয় না। মিত্রমহাশয় মায়ের মন্দিরের সম্মুখে আসিয়াছেন। হাটের বোঝা এখনও মাটিতে রাখেন নাই। তখনই পূর্ব্ব পরিচিত নিবারণ সাধুর সঙ্গে দেখা। নিবারণ মিত্র মহাশয়কে দেখিবামাত্র উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—"মিত্র মহাশয়! প্রভু এসেছেন।" "কই, কোথায়?" অতি আবেগপূর্ণ গদগদ কণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে মিত্র মহাশয় হাটের বোঝা মায়ের মন্দিরের দুয়ারে রাখিলেন। "এই যে ৺কালীর ঘরে আছেন" নিবারণের মুখে এই কথা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা মিত্র মহাশয় ভূমিগত হইয়া মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডবৎ করিলেন। দণ্ডবৎ করিয়া দরজার সম্মুখে মুখ বাড়াইতেই দেখিলেন—প্রভু বন্ধুসুন্দর শুভ্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া এককোণে দাঁড়াইয়া আছেন।

বন্ধুসুন্দরের ভাব অবস্থা দেখিবামাত্র মিত্র মহাশয় হাটে রটিত গুজবের মূল যে কোথায়, বুঝিয়া ফেলিলেন। বস্ত্রাচ্ছাদিত বন্ধুসুন্দরকে একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবধূর মতই দেখাইতেছিল। শান্ত, অদ্ভুত, হাস্য ও করুণ এই চারি রসের সঙ্করে মিত্র মহাশয় দিশাহারার মত হইয়া গেলেন। বন্ধুর আগমনে বিস্ময়। তাঁহারই বাড়ীতে আসিয়াছেন বলিয়া দৈন্য; গুজবের জন্য হাস্য এবং সত্যই তিনি আসিলেন ইহাতে পরম শান্ত রসের আনন্দ। এই চারি ভাবের অভিনব সমাবেশে

মিত্রগোপালের মুখখানি উল্লাসে ডগমগ। পবনদেব বাহক হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গ্রামময় অভিনব বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল। বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী দোকানী চাষী সকলের মুখেই এক কথা "প্রভু এ'সেছেন।"

প্রভু এ'সেছেন

মুহূর্ত্তমধ্যে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল—"প্রভু এ'সেছেন।" এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে যে প্রভু আসিবেন, তাহা কেহই জানিত না। মিত্র মহাশয়ও জানিতেন না। মিত্র মহাশয় বাকচরবাসীর আগ্রহের কথা প্রভুকে জানাইয়াছিলেন। প্রভুও আসিবার সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এত শীঘ্র যে আসিবেন, এবং বিনা সংবাদে এমন চুপি চুপি যে আসিবেন; ইহা খুবই অস্বাভাবিক। তাঁহাদের আশা ছিল, প্রভুর সংবাদ পাইলে তাঁহারা কীর্ত্তনের দল লইয়া যাইবেন এবং মহাসমারোহে কীর্ত্তনসহ প্রভুকে বহন করিয়া আনিবেন।

কিন্তু হায়—"কে জানিত আসবে এমন অনাহুতের মত।" অনাড়ম্বরের দেবতা এমন সহজ অবস্থার মধ্যেই আসিলেন যে, সহস্র পথচারী পথে তাঁহাকে দেখিয়াও অভিবাদন জানাইবার সুযোগ পাইল না। বাকচরবাসীর অন্তরের আগ্রহ ছিল তীব্র। অন্তর্য্যামী দেবতা যখন ওইটুকু জানিয়াছেন, তখন তাঁহার আর কোন আয়োজনের অপেক্ষাই নাই। নিবারণকে বলিলেন, "চল্ যাই, আর দেরী নয়।"

গ্রামের বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী সকলেই সকল কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। কুলবধূরা ঘনঘন উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিয়া গ্রাম মুখরিত করিয়া তুলিল। হাটের দিন সন্ধ্যাবেলা একটা পরমানন্দের বন্যা বহিতে লাগিল। খোল আসিল, করতাল আসিল, কাঁশর ঘণ্টা বাজিল, কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

এস এস নবদ্বীপ রায়
দীনজন ডাকছে হে তোমায়।

গানখানি আজ সার্থক হইয়া উঠিল। সত্যসত্যই আজ দীন-জনের ডাকে শ্রীনবদ্বীপ রায় আসিয়াছেন। বাকচরের ভক্তগণের চক্ষে ঝরঝর জলধারা বহিতে লাগিল। মন্দিরে শিবসীমন্তিনীও অসি ছাড়িয়া তৃতীয় নয়ন মেলিয়া ত্রিদিবেশ শ্রীদীননাথ নন্দনকে অভিনন্দন জানাইলেন। গাঁয়ের হাট ভাঙ্গিয়া ৺কালীবাড়ীতে আনন্দের হাট বসিল।

শুদ্ধ মাধুর্য্য

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে"

—শ্রীশুক

সকলে আনন্দে রঙ্গে বন্ধুসুন্দরকে সঙ্গে লইয়া মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। বন্ধুগোপালকে পরা-প্রীতির ঘরে রাখিয়া গোপাল মিত্র শাশ্বতী মিত্রতা সূত্রে বদ্ধ করিলেন এবং তদ্বারা তিনি সত্যসত্যই গোপাল মিত্র হইলেন। বন্ধুধনকে গৃহে পাইয়া মিত্র মহাশয় পরম আনন্দে উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে আনন্দ নৃত্যে বাকচর গ্রাম নাচিল।

সেই রজনী বাকচরবাসীর পরম শুভ-রজনী। সুস্নিগ্ধ কৃপা-চন্দ্রিকা ঢালিয়া নবনী অঙ্গিয়া বন্ধুচন্দ্রমসী বাকচরবাসী নরনারীর হৃদয় ক্ষেত্র উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। গ্রামবাসিগণ দলে দলে প্রভুবন্ধুর চরণে শরণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মিত্র মহাশয়ের গৃহে থাকিয়া বন্ধুসুন্দর ছোট বড় বালক বৃদ্ধ সকলের সহিত প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত মাধুর্য্যময়ী লীলা খেলা খেলিতে লাগিলেন। মিত্র মহাশয়ের একটি পুত্রের নাম নিতাই। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "গোপাল, নিতাইচাঁদ আমার দাদা হন, তোমার ছেলের নাম যখন নিতাই, তখন তুমি আমার জেঠা মহাশয়।" বন্ধুসুন্দর মিত্র মহাশয়কে "জেঠা" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। মিত্র ঘরণীকে ডাকিলেন, "জেঠাইমা"। অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত রহস্যময় এই সকল ডাক শুনিয়া সকলেই গলিয়া যাইত।

এই ভাবে ব্রজবিনোদিয়া বন্ধুবিনোদ বাকচরবাসীর সহিত গোপ-পল্লীর প্রেম লীলারসে বিহার করিতে লাগিলেন।

মায়াগন্ধশূন্য মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ভগবৎ প্রীতিই ভক্তিরস। ভক্তিরসের আড়ালে অন্তঃসলিলা জ্ঞানধারা থাকেই। সুদৃঢ় সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত স্নেহপ্রীতি যেখানে ভগবৎ বুদ্ধিকে ছাপাইয়া সেবা-পরিচর্য্যায় ভগবানকে অধীন করিয়া বশ করে, সেইখানেই ভক্তিরস ব্রজানুগমার্গে প্রেমমাধুর্য্যে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে, সম্ভ্রম-গৌরবযুক্ত বিভূতির আড়ম্বরে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত বিধিমার্গের ভগবৎ প্রীতিই বৈধী ভক্তি নামে কথিত হয়। বাকচরবাসী নরনারী আজ দীক্ষা শিক্ষা তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান আহ্নিক পূজা অর্চ্চনা অপেক্ষা না রাখিয়া প্রাণের সহজ প্রীতিতে বন্ধুসুন্দরকে প্রাণ প্রিয়তম নিজজন বোধে সেবা করিতেছেন। আর, পরা প্রেমের বিষয়-তত্ত্ব, ভালবাসার মূর্ত্ত-বিগ্রহ, স্নেহঘন-স্বরূপ শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরও তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রীতি স্নেহ আকর্ষণ ও আস্বাদন করতঃ জেঠা মহাশয়, জেঠাইমা, খুড়ীমা, প্রভৃতি সহজ মানুষের মত সম্বন্ধ পাতাইয়া প্রেম নিকেতনের খেলা খেলিতেছেন,—

"মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি,
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধাভক্তি।
আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন,
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন।"

তাই প্রাচীনেরা কহেন, বাকচর শুদ্ধ মাধুর্য্যের ধাম। বন্ধু এখানে চির-প্রেমাধীন।

দুহুঁ লীলা

চৈতন্যলীলামৃত পুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুহুঁ মিলি হয় সুমাধুর্য্য”

—শ্রীকৃষ্ণদাস

বাকচরে ছোট বড় দুইটি কীর্ত্তনের দল গঠিত হইল। বড় দলে গোপাল মিত্র, নেচু সাহা, প্রহ্লাদ সাহা, বনমালী সাহা, মদনমোহন সাহা, যজ্ঞেশ্বর সাহা, রামচরণ পাল, মহিমচন্দ্র দাস, মহীন্দ্র সিকদার প্রমুখ ঊনপঞ্চাশজন গায়ক আছেন। ছোট দলে কার্ত্তিক, নিতাই, মুকুন্দ, বিহারী, কিরণ, তারক, পূর্ণ, সতীশ, বঙ্কু, কোধা গোপাল, শশধর ও মতিলাল প্রভৃতি বালকবৃন্দ।

বন্ধুসুন্দর নদীয়ার পতিতপাবন লীলাবেশে “বড় দল” লইয়া ঘরে ঘরে নগরে নগরে দেশে বিদেশে কীর্ত্তনের খেলা খেলেন। আর ব্রজের মাধুর্য্যে লীলাবেশে “ছোট দল” লইয়া রাখালিয়া খেলা, জেঠী খুড়ী ও মায়েদের লইয়া বালগোপাল লীলা ও হিমি, কুদী, ললিতা প্রভৃতি ছোট ছোট বালিকাদের লইয়া মধুর রসের অভিনয় করেন। একই সময় এই দুই লীলার অভিনয়, বন্ধুসুন্দরের বাকচরের অবস্থান কালে যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অতি অভিনব। বাল বৃদ্ধ নরনারী বালক বালিকা সকলের নির্ম্মল প্রীতির পাত্র হইয়া প্রভু বন্ধু-সুন্দর যেভাবে বাকচরে বিহার করেন, তাহাকে ভাষা দেওয়া মাদৃশ জীবের লেখনীর অসাধ্য। এই প্রথমবারে শ্রীশ্রীবন্ধুহরি

মাঘ ফাল্গুন চৈত্র এই তিন মাস একাধিক্রমে বাকচর বাস করেন। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ (১২৯৮) দুইমাস কখনও বাকচর কখনও ব্রাহ্মণকান্দায় থাকেন। দুই স্থানের ভক্তের প্রীতির টানা টানিতে একস্থানে থাকা সম্ভব হইত না। ব্রাহ্মণকান্দার ও মোহান্ত ভক্তগণের টানে ফরিদপুর আসিতেই হইত।

এই সময় প্রভু বন্ধুর কীর্ত্তনের খেলাই একমাত্র কার্য্য। নাম-কীর্ত্তন, পদকীর্ত্তন, বিভিন্ন ছন্দে তালে রচনা করিয়া, বিভিন্ন সুরে ঢঙ্গে কীর্ত্তন করাইয়া, নব নব কীর্ত্তনের দল গঠন। প্রভাতে টহল কীর্ত্তন, টহলের জন্য নূতন গান। বৈকালে নগর কীর্ত্তন, সেজন্য নূতন গান। সন্ধ্যায় আরতি, সেজন্য নূতন গান। নিশায় নিশা কীর্ত্তন, সেজন্য নূতন গান। কৃষ্ণরূপ গৌররূপ নিতাই প্রচারণ, প্রার্থনা নিবেদন দৈন্য বোধিকা, গানে গানে—কীর্ত্তনে কীর্ত্তনে গ্রাম সহর নগর প্রান্তর মাঠ ঘাট পদ্মাতীর মুখরিত হইয়া থাকিত। হরিনামের অমৃত প্রবাহে নরনারী নিরন্তর সাঁতার খেলিত। বন্ধুসুন্দর পতিতপাবন ভাবে কীর্ত্তন প্রচারণ, রসরাজ ভাবে প্রেমের অভিনয় প্রকটন এবং কীর্ত্তন রচনা ও শ্রবণ দ্বারে স্বানুভাবানন্দে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-গৌর-গদাধর নাম রূপ ও লীলা তরঙ্গে ডুবিয়া আস্বাদন সুখে নিমজ্জমান রহিতেন।

এইভাবে জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত বাকচর ব্রাহ্মণকান্দা অবস্থান করিয়া বন্ধুসুন্দর বকুলালের আকর্ষণে কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। বন্ধুসুন্দরের নির্দ্দেশমত জীবন যাপনে বকুলালের দেহ মনের ভাব ও অবস্থা তখন বড়ই সুখদ। বকুলালের

বয়স চলিয়াছে যৌবনের দিকে, ভাবটা চলিয়াছে বাল্যের দিকে। বয়স তাঁর যত বাড়ে, বাল্য ভাবও তাঁর তত বাড়ে। ঐ ভাবটুকুই তাঁর বন্ধুসেবার উপচার। বকুলালের মিরজাফর ষ্ট্রীটস্থিত মেসে কিছুদিন অবস্থান করিয়া ইচ্ছাময় বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপে যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

অন্নদা দত্তের অনুভূতি

মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং।
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥

—শ্রীযামুনাচার্য্য

অন্নদাচরণ দত্ত পরম হরিভক্ত। হুগলীতে বাস করেন। হরিনাম কীর্ত্তনে তাঁহার আবেশ হয়। ভাবাবেশে তাঁহার অনেক দিব্য দর্শন হয় ও তখন অনেক অপূর্ব্ব কথা বলেন। কথার মধ্যে অনেক ভবিষ্যৎ বাণী থাকে। অনেক ভবিষ্যৎ বাণী তাঁহার সত্য হইয়াছে। অনেক সজ্জন অন্নদাবাবুর গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন।

বর্ষার সময় (১২৯৮) বহু ভক্ত অন্নদা বাবুর বাড়ীতে মিলিত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে কাটাইতেছেন। দত্ত মহাশয় প্রায়ই আবিষ্ট অবস্থায় বলেন "শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন।" কোথায় কিরূপে আসিয়াছেন জানিবার জন্য ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহ। অপর একদিন আবেশে বলিলেন, "মহাপ্রভু সপরিকরে আবার এ'সেছেন। আগামী কল্য নবদ্বীপ যাবেন। ষ্টীমারে তাঁহার দর্শন হবে।"

যে সকল ভক্ত দত্ত মহাশয়ের আবেশবাণী বেদবাণীর মত সত্য বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা এই সংবাদে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সকলেই পরদিবস ষ্টীমার ঘাটে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। দত্ত মহাশয় নিজেও যখন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নিজ আবিষ্ট অবস্থার বাণীর কথা শুনিলেন, তখন তিনি নিজেও আগামী দিনে ষ্টীমার ঘাটে যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। ঐ সময় কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ প্রত্যহ একখানি ষ্টীমার যাতায়াত করিত।

নব গৌর

আষাঢ় মাস। তপন্ দেব আকাশে অনেক দূর উঠিয়াছেন। কিন্তু মেঘমণ্ডলের আবরণ তাহার প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। ভানু জলদের খেলা দেখিয়া ভাবুক ভক্ত,

"নাহং প্রকাশ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ"

এই গীতার বাক্য স্মরণ করিতেছেন।

বর্ষার জল পূর্ণ হইয়া গঙ্গার কুল ভাসাইয়া কলকুল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কলিকাতা হইতে হোরমিলার কোম্পানীর একখানি ষ্টীমার যাত্রী বহন করিয়া নবদ্বীপের দিকে ছুটিতেছে। মহেন্দ্রবাবু শিশিরবাবু প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া অন্নদা দত্ত মহাশয় নবগৌর দর্শন লালসায় হুগলীর ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের প্রাণে আকুল আগ্রহ। নয়নে লোলুপ তৃষ্ণা।

ষ্টীমার আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। হুগলীর যাত্রীরা অবতরণ করার পূর্ব্বেই কোনমতে পাশ কাটাইয়া অন্নদাবাবু সদলে ষ্টীমারে উঠিয়া গেলেন। তাঁহাদের বিস্ফারিত ক্ষুধার্ত্ত নয়ন বৎসহারা গাভীর মত বাঞ্ছিত ধন খুঁজিতে লাগিল। "ঐ যে, ওখানে কি" অন্নদাবাবু বালকের মত চেঁচাইয়া উঠিলেন। চন্দ্রকান্তমণি, চিনিতে কি সময় লাগে? নিজের ছটাতেই সে নিজে ধরা পড়ে।

ষ্টীমারের এক কোণে নির্জ্জন স্থানে একটী শুভ্র পর্দ্দা ঘেরা কী রহিয়াছে। পর্দ্দার যেদিক ষ্টীমারের সম্মুখভাগে সেই দিকটী খোলা, কারণ ঐদিকটী লোক চক্ষুতে পড়ে না। উৎকণ্ঠিত দল সেই দিকটীতে গিয়া দেখিলেন মৃগচর্ম্মাসনে নবগৌর উপবিষ্ট আছেন। কাহারও দিকে দৃষ্টি নাই। সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র-বস্ত্রাবৃত, কৃষ্ণকেশমণ্ডিত শ্রীমস্তক, পূর্ণ শশধর জিনি' শ্রীবদনখানি দৃষ্ট হইতেছে। রাঙা টুকটুকে দু'টী করতল দেখা যাইতেছে। "পুরটসুন্দরদ্যুতি"ই পুরুষবরকে পরিচয় করাইয়া দিতেছিল। মরি মরি কত রূপ! দর্শকগণের নয়নে ধরিতেছে না।

সাশ্রুনেত্রে অন্নদাবাবু সবান্ধবে প্রণত হইলেন। নব-গৌরচন্দ্র নীরবে সহাস্য বদনে তাঁহাদের দিকে একটি কৃপাদৃষ্টি-পাত করিলেন। সকলে শান্ত হইলেন।

প্রাণভরা ক্ষুধা ও আগ্রহ লইয়া নয়ন ভরিয়া সকলে রূপসুধা পান করিতেছেন। সকলে সব ভুলিয়া দেখিতেছেন। ষ্টীমার যে অনেকবার সতর্কতার সাড়া দিয়া ছাড়িয়া দিল, সেদিকে তাঁহাদের কাহারও হুস্ নাই। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।

মনচোর এমনি ভাবে তাহাদের মন চুরি করিয়াছেন যে তাঁহারা নবদ্বীপ যাইবার জন্য তৈয়ারী হইয়া না আসিলেও নিরুদ্বেগে চলিতে লাগিলেন।

ষ্টীমার নবদ্বীপ পৌছিল। শ্মশান ঘাটের নিকটে ষ্টীমার ভিড়িল। নবগৌর অবতরণ করিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ হুগলীর ভক্তবৃন্দও চলিলেন। কিন্তু এত দ্রুত গতিতে প্রভু চলিতে লাগিলেন যে কাহারও সামর্থ্য নাই তাঁহার সঙ্গে চলেন। ভক্তগণ প্রথমে দ্রুত হাঁটিলেন। তারপর দৌড়াইলেন। কিন্তু কিছুতেই প্রভু বন্ধুর গতিবিধি অনুসরণ করিতে পারিলেন না। কোন দিকে যে নবগৌর অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহারা কিছুতেই তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে নিরুপায় হইয়া প্রত্যেক ঠাকুর বাড়ী অনুসন্ধান করিতে করিতে, তাঁহারা শ্রান্তদেহে হর্ষে বিষাদে হুগলী ফিরিয়া আসিলেন। লীলাময়ের এই অদ্ভুত খেলা কে বুঝিবে!

"মানুষ গণনার মধ্যে না পড়ি"

"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ
মানুষীং তনুমাশ্রিতং।"

—শ্রীভগবান

শ্রীধাম নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীবন্ধুসুন্দর কি করিলেন কোথায় থাকিলেন সকলই অজ্ঞাত। কি ভাবে গঙ্গাস্নান করিলেন, কি ভাবে ধূলায় লুটাইলেন, কি ভাবে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈত প্রভু দর্শন করিলেন, তাহা কেহ জানে না। কয়েকদিন স্বানুভাবানন্দে বিভোর থাকিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে উদয় হইলেন। অঙ্গনের মোহান্ত হরিদাস বাবাজীর যত্নে কয়েকদিন সেখানে থাকেন।

ঐ বৎসর আদম সুমারীর লোক গণনা হইতেছিল (ইং ১৮৯১) নবদ্বীপে সেইদিন লোক গণনা হইবার কথা। রঙ্গীয়া শ্রীশ্রীবন্ধু-বিনোদ মোহান্তজীকে কহিলেন, "মোহান্তজী, আমাকে এমন একটু থাকিবার স্থান দিতে পারেন কি, যাহাতে আমি মানুষ গণনার মধ্যে না পড়ি ?"

গূঢ়-কপট-মানুষ, তোমাকে নমস্কার! মানুষীতনু আশ্রয় করিয়া মানুষের মধ্যে আসিয়াও মানুষ গণনার মধ্যে পড়িতে অনিচ্ছা! মোহান্তজী কোনও ধর্ম্মশালায় একটি নির্জ্জন কক্ষে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। বন্ধুসুন্দর তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ক্রমশঃ দক্ষিণ মুখে চলিতে চলিতে শ্মশানের নিকট গেলেন। সেখানে গিয়া একটি ঝোঁপের

অন্তরালে আপনাকে ঢাকা দিয়া আপন মহাভাবানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী ভাব—ভক্তভাব ও ভগবদ্ভাব। ভক্তভাব যখন, তখন তিনি কখনও মঞ্জরীভাবে আস্বাদক—কখনও বা দীনহীন সেবক। আর যখন ভগবদ্ভাব, তখন তিনি কখনও ব্রজভাবে রঙ্গলাল, নদীয়ার ভাবে প্রেমের ঠাকুর, কখনও আবার পরিপূর্ণ স্বরূপ-শক্তিতে স্থিত আত্মস্থ স্বতন্ত্র ঈশ্বর। এই পাঁচটী অবস্থা বা ভাবের মধ্যে ডুবেন ও ভাসেন। শেষোক্ত ভাবটীকে ভক্তগণ "হরিপুরুষ" ভাব বলিয়া থাকেন। আমি যেন "মানুষ গণনায় না পড়ি" এই কথাটী মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুসুন্দরের হরিপুরুষ ভাবের স্ফুর্ত্তি হইল। পূর্ণতম ভগবৎ-স্বরূপে স্থিত হইয়া ঝোঁপের আড়ালে শয়ন করিয়া রহিলেন। এই হরিপুরুষ ভাবেই অধিক সময় শয়নে থাকেন ও অঙ্গ হইতে অত্যধিক জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়। শ্রীশ্রীপ্রভুর অঙ্গের জ্যোতিঃ যেন জোনাকীর মত ইচ্ছামত প্রকাশ করেন বা অপ্রকাশিত রাখেন। প্রকাশ করিলেও ইচ্ছামত তাহা সীমাবদ্ধ রাখেন।

ঝোঁপের মধ্যে খানিকটা স্থান অঙ্গচ্ছটায় অতিশয় দেদীপ্যমান করিয়া শ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দর শয়ন করিয়া আছেন। অনন্ত বিশ্বসংসার সে বিশ্বকেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গতিতে চলিতেছে।

সিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য

"সিতিকণ্ঠ কণ্ঠমণি প্রাণধন বন্ধু"

—স্মরণমঙ্গল

নবদ্বীপ ধাম শচীনন্দনের নিত্য আবির্ভাব ভূমি হইলেও প্রদীপের তলদেশের মত নবদ্বীপ ধামে একদল পণ্ডিত চিরকালই গৌর বিরোধী আছেন। মাঝে মাঝে তাঁহাদের দল শক্তিশালী হইয়া উঠে। বাংলা ১২৫০ সালের কাছাকাছি একবার ঐ দল প্রবল হইয়া উঠায় নানা স্থানে তর্ক বিতর্ক চলিতে থাকে। গৌরহরি ভক্ত কি ভগবান ইহাই বিচারের বিষয়। যদিও গৌর-সুন্দরের ভগবত্ত্ব যুক্তির অতীত, তথাপি ইহা তো অযৌক্তিক নহে। যুক্তি-বীর ভক্ত-পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় বিরুদ্ধবাদীকে বিচার যুদ্ধে আহ্বান করিয়া স্বীয় ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রতিভা বলে শচীনন্দনের স্বয়ং ভগবত্ত্ব স্থাপন করতঃ তখন নবদ্বীপের মান রক্ষা করেন। তাহাতে তিনি অগণিত ভক্তের আশীর্ব্বাদ ও কৃপা লাভ করেন। ভক্ত কৃপায়ই ভগবৎ কৃপার দুয়ার খুলিয়া যায়। ব্রজনাথের ভক্তিময় পাণ্ডিত্যে ও প্রেমময় সেবা নিষ্ঠায় শ্রীশচীদুলাল তাঁহার গৃহে প্রকট হয়েন। আজিও সেই ব্রজনাথের গৃহ নবদ্বীপধাম মাঝে "হরিসভা" নামে বিখ্যাত। হরিসভায় নটবর গোরাচাঁদ আজিও সুপ্রকট।

ব্রজনাথের পুত্র মথুরানাথ পদরত্ন ন্যায় ও স্মৃতির পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান সিতিকণ্ঠ পিতামহের ভাবধারা পুনরায় লাভ করেন। সিতিকণ্ঠের কেবল যৌবন

উন্মেষ হইয়াছে। মূর্ত্তিটী চিত্তাকর্ষী। প্রাণটি গৌর-গত। ব্যবহার ভক্তোচিত। সিতিকণ্ঠ গৌরহরির ভোগ দেন আর ভাবেন, প্রভু, "ভোগ যে গ্রহণ করিয়াছ তাহা যদি চক্ষে না দেখিলাম, তবে তৃপ্তি কই। যদি কথা না বল—কাছে না আস, কাছে না ডাক, তবে অভ্যাস বশতঃ নিত্য নৈমিত্তিক সেবার আয়োজন মাত্র করিয়া পরা শান্তি কই!" সিতিকণ্ঠ "রাগ" রাজ্যের মানুষ, একেবারে প্রত্যক্ষ চাই—একবিন্দু পরোক্ষও সহ্য হয় না।

সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী

সন্ধ্যা হয় হয়। বর্ষার তরঙ্গায়িত গঙ্গার সান্ধ্য দৃশ্য মনোরম। দলে দলে লোক জপের মালা হাতে লইয়া গঙ্গার তীরে শোভা দর্শনে অবগাহনে, আলাপনে যেন বিদায়োন্মুখ সবিতৃদেবকে অভিনন্দন জানাইতেছে। সিতিকণ্ঠ লোকসংঘট্ট বেশী ভাল বাসেন না। একা বসেন, একা ভাবেন, একা চলেন। আজও একাকীই বেড়াইতে বেড়াইতে শ্মশানের দিকে যাইতেছেন। মনে মনে গৌর কথা ভাবিতেছেন, গৌরের নদীয়া বিহারের কথা ধ্যান করিতেছেন। শ্রীবাস অঙ্গন ছাড়াইবার কালে—শ্রীবাস চন্দ্রের কথা মনে পড়িল। তারপর শ্রীবাসের কথাই ভাবিতেছেন। সিতিকণ্ঠ ভাবিতেছেন, সারা নদীয়ায় শ্রীবাসের মত ভাগ্য আর কাহারও নাই। ব্রজে যমুনা-পুলিনের যে গৌরব, গৌড়ে শ্রীবাস অঙ্গনেরই সেই গৌরব। সিতিকণ্ঠের অন্তঃহৃদয়ে শ্রীবাসের ভাগ্যে লোভ জন্মিতেছে।

শ্রীসিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য

শ্রীউমাশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

শ্মশান ছাড়াইয়া একটু অগ্রসর হইতেই একটি অদ্ভুত দৃশ্য সিতিকণ্ঠের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রথম ভাবিলেন, ঝোপের অপর পার্শ্বে কোনও চিতা জ্বলিতেছে। তারপর দেখিলেন একটুও ধোঁয়া নাই। কোন কিছু দগ্ধ হইবার মত বিন্দুমাত্র শব্দ নাই। লোকজনও সেখানে কেহ নাই। ক্রমশঃ দেখিলেন, এ তো কোন আগুনের জ্যোতি নয়। ষ্টীমারের অগ্রভাগে যে আলোটি জ্বলে খানিকটা তাহার মত। কিন্তু আশ্চর্য্য! আলোটি ছড়াইয়া যাইতেছে না। একটি স্থানেই আবদ্ধ। জ্যোতিটি কী স্নিগ্ধ! নয়ন জুড়ায়। কী মধুর প্রাণাকর্ষী! চিত্ত বিমুগ্ধ হয়। সিতিকণ্ঠ ভয় পাইলেন না। জ্যোতির আকর্ষণে তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই একটি অননুভূতপূর্ব্ব গন্ধে তাঁহার মনপ্রাণ আমোদিত হইয়া উঠিল।

স্নিগ্ধচ্ছটা নয়ন আকর্ষণ করিতেছে। অপ্রাকৃত সৌরভ নাসিকা আকর্ষণ করিতেছে। আর কি যেন এক অজ্ঞাত বস্তু চুম্বকের মত সিতিকণ্ঠের মন আকর্ষণ করিতেছে। সিতিকণ্ঠ মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই সর্ব্বাকর্ষী পরম বস্তুটীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া কী দর্শন করিলেন,—

স্নিগ্ধোজ্জ্বল গোলাকার জ্যোতিঃপিণ্ডের মধ্যস্থলে পুরট-সুন্দর এক পুরুষরত্ন অলসরসে বিভোর। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন তাঁহার মর্ম্মস্থলে বলিয়া উঠিল, এই সেই চির আকাঙ্ক্ষিত ধন—সেই নদীয়ার গৌরচন্দ্র!

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান স স্বয়ময়ম্
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

চির পরিচিতের মত বন্ধুসুন্দর ডাকিলেন, "সিতিকণ্ঠ!" চির অনুগতের মত যুক্তকরে সিতিকণ্ঠ উত্তর করিলেন,—"প্রভো!" শ্মশানের পার্শ্বে ঝোপের অন্তরালে ভক্ত ভগবানের অপূর্ব্ব মিলন হইল। কে যে কাহাকে কি দিল, নিল, তাহা তাঁহারাই জানিল। গম্ভীর প্রকৃতি সিতিকণ্ঠজী কোনদিনই সব কথা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন—"একটী দর্শনের মধ্যেই সব।"

দুই প্রভু

সিতিকণ্ঠের আর্ত্তিময় নিবেদনে বন্ধুসুন্দর তাঁহার হরিসভায় উপস্থিত হইলেন। আসিবার পথে সিতিকণ্ঠ বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, প্রভুর সেই নিরূপম জ্যোতিঃ অনেকটা সম্বরিত হইয়া গেল। আসিবার পথেই কৃপাময় স্নেহ পরবশ হইয়া সিতিকণ্ঠকে স্বীয় অঙ্গস্পর্শ দানে কৃতার্থ করেন। স্পর্শনাবধি তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন শরীরের মধ্যে একটি তড়িৎ শক্তি ঝলক খেলিতেছে। বহুকষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া তিনি প্রভুর সেবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। হরিসভায় শ্রীগৌরসুন্দরের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটী অপূর্ব্ব মাধবীলতার কুঞ্জ। সেই কুঞ্জের মধ্যভাগে একটি গৃহে বন্ধুসুন্দরের আসন নির্দ্দিষ্ট হইল।

নটবর গৌরের আরতী হইয়া গেল। বন্ধুসুন্দর গৌর দর্শন করিবার জন্য আসিয়া বামপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। গৌর দর্শনে

নবগৌরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। নবগৌর দর্শনে গৌরের রূপান্তর উপস্থিত হইল। দু'য়ের একই ভাব, একই রূপ, একই ভঙ্গি, একই হাসি, একই চাহনী, একই লহুলহু প্রেমরসখনি। গৃহ কোণে দাঁড়াইয়া সিতিকণ্ঠ নিভৃত কুঞ্জ কক্ষের মোহন মাধুরী লুটিতে লাগিলেন।

দুইটি প্রভু। কে যে দ্রষ্টা, কে যে দৃশ্য—কে যে আশ্রয়, কে যে বিষয়, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। কাহার রূপসুধা আস্বাদনে কে যে মুগ্ধ, তাহা বোঝা যায় না। মনে হয় "চারি-চক্ষু এক চক্ষু।" প্রত্যহই বন্ধুহরি ঐ একই ভাবে গৌরহরি দর্শন করিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থানুবৎ দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন। কখনও আবার উভয়েই একই কালে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেন। গৌরসুন্দর ঠিক যেভাবে বাহুযুগল তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, বন্ধুসুন্দরও ঠিক সেই ভাবে হেমদণ্ড ভুজযুগল তুলিয়া দাঁড়াইয়া দুলিতে থাকিতেন। তখন আসনস্থ গৌরহরিও দুলিতেন। এই অপূর্ব্ব দর্শন মাধুরী আশেপাশে লুকাইয়া ভাগ্যবান ভক্ত লুটিয়া লইতেন।

ক্ষীরোদচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ পদবীধারী মহাশয়ের একজন কৃতী ছাত্র। হরিসভার বাড়ীতেই থাকিতেন। কোনও লোক জগদ্বন্ধুসুন্দরের দর্শনের জন্য আসিয়া কোনও কারণে দর্শনে বঞ্চিত হইয়া ব্যথিত মনে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, ক্ষীরোদচন্দ্র বলিতেন, "ঐ মন্দিরে যিনি আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া যান। ব্রজনাথের স্থাপিত নৃত্যময় প্রেমমাখা গৌর, আর তার পৌত্র সিতিকণ্ঠ আনীত রঙ্গময় বস্ত্রঢাকা গৌর—দুই একই। একজন আর এক

জনের ফটোগ্রাফ মাত্র। অই এক জনকে দেখিয়া যান, তা' হইলেই আর একজনকে দেখা হইবে।"

সকলেই লক্ষ্য করিতেন, বন্ধুসুন্দরের আগমন অবধি গৌর-সুন্দরের অসমোর্দ্ধরূপের ছটা যেন আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। ভাগ্যবান সিতিকণ্ঠ প্রাণ ভরিয়া দুই প্রভুর শোভা দর্শন ও সেবা পরিচর্য্যায় জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে লাগিলেন। বন্ধু-সুন্দর প্রিয় সিতিকণ্ঠকে রাগানুগা সাধন ভজন প্রণালী, মালা মন্ত্রাদি সকলই দান করিলেন। একটি খাতায় প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় শ্রীহস্তে লিখিয়া দিলেন। বন্ধুর পরম কৃপায় সিতিকণ্ঠও ক্রমে ভজনের গভীর হইতে গভীরতর নিভৃত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

একদিন গৌরহরির সেবার দ্রব্যাদি বিশেষ কিছুই গৃহে নাই। সেবানিষ্ঠ সিতিকণ্ঠ একটু চিন্তিত মনে প্রভু বন্ধুসুন্দরের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "প্রভু, আজ ঘরে সেবার দ্রব্য কিছুই নাই।" বন্ধুসুন্দর তখন আসনস্থ ছিলেন। সিতিকণ্ঠের কথা শুনিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া, শ্রীমন্দিরস্থিত গৌরসুন্দর ঠিক যেভাবে যে ভঙ্গীতে অবস্থিত আছেন, সেইভাবে বাহুযুগল প্রসারণ ও নয়নভঙ্গী করিয়া সস্মিত বদনে আপনার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ আপনাকেই দেখাইয়া কহিলেন, "ওঁকে বল।" ভক্তপ্রবর সিতিকণ্ঠ সে অপরূপ মাধুরীসুধা দুই নয়ন ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে নদীয়ায় নদীয়া-নাগরের গোপনলীলা চলিতে লাগিল।

রাই মাতা

সকলে যে-সময়ে স্নান করেন, বন্ধুসুন্দর সে-সময়ে স্নান করেন না। সকলে যে-ঘাটে স্নান করেন, বন্ধুসুন্দর সে-ঘাটে স্নান করেন না। সকলে যে-পথে চলেন, বন্ধুসুন্দর সে-পথে চলেন না। সকলই স্বতন্ত্র। সকলের আড়াল দিয়া গোপনে গোপন পথে যখন বা একটু আধটু বাহির হন, তখনও সর্ব্বগাত্র বস্ত্রাবৃত। এত আবরণের মধ্য দিয়াও কিন্তু চিরকালের চিহ্নিত আপন জন যাঁহারা, তাঁহারা চিনিয়াই ফেলিত। দেখিলেই চিনিত, চিনিলেই আত্মসমর্পণ হইয়া যাইত। সমর্পিত জীবন পাইলে আত্মসাৎ করার যে চিরদিনের স্বভাব, সে স্বভাবটি বন্ধুর সহস্র আবরণের তলেও অক্ষুণ্ণভাবেই বিরাজমান ছিল।

হরিসভার উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটি ছোট ঘরে রাইমাতা নাম্নী একটী ভক্তিমতী মাতা বাস করিতেন। নিত্য লীলার স্মরণে ও মননেই তাঁহার সারাদিন কাটিত। কবে "প্রাণকান্তের দেখা পাব" ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়া ঘরের কোণে রাঙা চক্ষে বসিয়া থাকিতেন, এই রাইমাতা।

একদিন গভীর রাত্রে গঙ্গায় স্নান করিয়া বন্ধুসুন্দর হরি-সভায় ফিরিতেছেন। শ্রীঅঙ্গের অর্দ্ধেক উন্মুক্ত। তখন কেন কি জানি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে রাইমাতা নিজ ক্ষুদ্র গৃহটির দুয়ার খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মাতা হঠাৎ দেখিলেন একটি বিদ্যুতের মূর্ত্তি ঝলক দিয়া চলিয়া গেল। মাতা চমকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু

ইনি কে—কোন দিক হইতে আসিয়া কোন দিক গেলেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল সোনার তনুর প্রোজ্জ্বল ছটায় নয়ন মন ধাঁধিয়া গেল। পরদিন রাত্রে ঐ বস্তু দর্শনের লোভে মাতা দরজা ফাঁক করিয়া বসিয়া মালা করিতে থাকিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিক কার যেন অঙ্গ গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল। মাতা দরজা একেবারে খুলিলেন। খুলিতে খুলিতে সে রূপের মানুষ ঝলক দিয়া চলিয়া গেল। মাতা পশ্চাতে ছুটিয়া গেলেন। কতদূর গিয়া মাতা দেখিলেন সে সোনার মানুষ হরিসভায় প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

মাতা নিজজন চিনিয়া ফেলিলেন। ভজনের চোখে ভজনের ধন সহজে ধরা পড়িবারই কথা। মাতার সারাদিন সাধন ভজনে কেবল ঐ রূপই চিত্তে ভাসিতে লাগিল। গভীর রাত্রে মাতা আবার দর্শনের লোভে দুয়ার খুলিয়া বসিয়া থাকিলেন, কিন্তু সে দিন আর কেহই আসিল না। একদিন দুইদিন তিন দিন চার দিন, মাতা গভীর রজনী হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত দুয়ার ফাঁক করিয়া মালা লইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করেন আর লুব্ধ-নয়ন পথের দিকে ফেলিয়া রাখেন। নয়ন ধারায় বসন ভিজিয়া যায়। কিন্তু কৈ, আর তো আসেন না। আর তো দেখা পান না। বাহিরে না দেখিলে কি হইবে? মাতার অন্তরে সেই সোনার ঠাকুরের ধ্যান ছাড়া আর কিছুই নাই—মাতা চিরকাল যে-ধন ধ্যান করিয়াছেন, তাহাই ধ্যান করিতে বসেন—কিন্তু একটু পরেই সে মুখ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়! একখানি নূতন বদনচন্দ্র

হাসিতে থাকে। মাতার সাধন ভজন আর্ত্তি আগ্রহ উৎকণ্ঠা সবই সীমান্তে পৌঁছিল। প্রাণ বাঁচে না।

সেদিন প্রভাত বেলা প্রাণের ঠাকুর পথ আলো করিয়া আসিলেন। মাতা দর্শন পাইবামাত্র উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া বাহির হইলেন। বন্ধুসুন্দর হরিসভায় প্রবেশ করিলেন—মাতাও পাগলিনীপারা হরিসভায় প্রবেশ করিলেন। মাতা বাতাহত স্বর্ণলতিকার ন্যায় প্রাণের দেবতার পদে আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রভুবন্ধুও নিজ নিত্য দাসীকে চিনিয়া লইলেন। তারপর, ভক্ত ভগবানের কত খেলা, কেই বা জানে, কেই বা লিখিবে! শ্রুত আছি, মাতার ভজনের বিশুদ্ধতা ও সেবার ঐকান্তিকী নিষ্ঠায় বন্ধুসুন্দর কখনও কখনও স্বেচ্ছায় তাহাকে দর্শন দিতেন। শুদ্ধ স্নেহে দেওয়া মাতার সেবার দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করিতেন।

কে জানে কি ভাবে রাইমাতা শ্রীশ্রীবন্ধুর একখানি শ্রীমূর্ত্তি (ফটো) সংগ্রহ করেন। বকুলালের সঙ্গে বৌবাজার ষ্টুডিওতে বন্ধুসুন্দর আপনার যে আলোক চিত্র দান করেন, সেই চিত্র। রাইমাতা ঐ শ্রীমূর্ত্তির চরণে তুলসী চন্দন দিয়া পূজা করিতেন।

আজ অগণিত ভক্তের গৃহে শ্রীশ্রীবন্ধুর মূর্ত্তি তুলসী চন্দনে অর্চ্চিত হইতেছেন। এই রাইমাতাই সেই অর্চ্চনার আদি গুরু। মাতা এই প্রেরণা কোথায় লাভ করেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মনে হয়, বন্ধুসুন্দরের কৃপার বাতাসে তাঁহার এই প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্বাভাবিক। রাইমাতাকে কেহ কেহ রাই উন্মাদিনী বলিতেন। সত্য সত্যই কীর্ত্তন শ্রবণে তাঁহার

দেহে যে সব সাত্ত্বিক লক্ষণ ফুটিত তাহা দেখিলে বিশ্বাস না করিয়া উপায় ছিল না, যে ইনি রাধারাণীর কোন নিত্য সেবার কিঙ্করী হইবেন। রাই মাতার বোন ঝি জগদিদিও বন্ধুসুন্দরকে পরম ধন জানিয়া ঐ চরণের অযাচিত কৃপা লাভে ধন্যা হইয়াছিলেন। নবদ্বীপ পরা-মা তলার যোগিনীমাতা নাম্নী আর একটি ভক্তিমতী মাতাও বন্ধুর রূপগুণ মাধুর্য্যে আকৃষ্টা হইয়া কৃতার্থা হইয়াছিলেন।

চরণতলে চিহ্ন

শরৎ কালের প্রথম ভাগে শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপ হইতে ষ্টীমার যোগে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সিতিকণ্ঠের ইচ্ছা বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপ হরিসভাতেই থাকেন। আর কোথাও না যান। কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে কোথাও বাঁধিয়া রাখিবার সামর্থ্য কাহার? "সিতিকণ্ঠ, তোমার এখানে আনন্দের হাট বসিবে, আবার আসিব" এই আশ্বাস দিয়া বন্ধুসুন্দর কলিকাতা যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ যাবৎ ষ্টীমারের ধূম পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, ততক্ষণ সিতিকণ্ঠ গঙ্গার তীরে পলকহীন নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। গোস্বামী রঘুনন্দন গলবস্ত্র হইয়া যুক্ত করে বন্ধুসুন্দরকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়া তপ্ত অশ্রুনীর ঢালিয়া গঙ্গায় বিরহ বেদনার তর্পণ করিতে লাগিলেন। স্বতন্ত্র পুরুষ বন্ধুহরি যখন যাহাকে ছাড়িয়া যান, তখন আর তাহার দিকে ফিরিয়া তাকান না।

বকুলাল মিরজাফর ষ্ট্রীটের মেস ছাড়িয়া ছকুখানসামার লেনে একটি মেসে অবস্থান করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ অজ্ঞের

মত মিরজাফর ষ্ট্রীট ঘুরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে ৩নং ছকুখানসামা লেনে বকুলালের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। চিরকাল ভক্তই ভগবানকে খোঁজে, মানুষরূপে আসিয়া ভগবানই ভক্তকে অনুসন্ধান করেন। ঐ অনুসন্ধানের মাঝে তাঁর যেন কি একটা আনন্দ আছে।

বাম জানুর উপর দক্ষিণ চরণখানি টানিয়া আনিয়া ধীরে শান্ত অবক্রভাবে বন্ধুসুন্দর নিশ্চিন্তে বসিয়া ঈষৎ দুলিতেছেন। অস্তগামী সূর্য্যের লালিম কিরণ রেখা গবাক্ষ পথ দিয়া বন্ধুসুন্দরের সোনালী অঙ্গ ধাতুরাগে অনুরঞ্জন করিতেছে। পার্শ্বস্থ বকুলালের দৃষ্টি হঠাৎ জগৎসুন্দরের চরণের দিকে পতিত হইল।

"জগৎ, তোমার পায়ের তলে কি আলতা মাখিয়াছ!"

সে কি রে, বকু, আলতা মাখিব কেন?

"তবে এত রাঙ্গা!!"

"এ তো স্বাভাবিকই এরূপ। আর কখনও দেখিস নাই। কেবল কি লাল,—আরও কত চিহ্ন এই পায়ের তলে আছে, দেখবি।"

বকুলাল আরও নিকটে ঘিসিয়া একটু ঝুকিয়া পড়িলেন। জগৎসুন্দর দেখাইতে লাগিলেন। "এই দেখ একটা পতাকা চহ্ন। এই দেখ পদ্ম, এই দেখ বজ্র চিহ্ন। চম্পক কলিকা সদৃশ তর্জ্জনী অঙ্গুলিটি দ্বারা বন্ধুসুন্দর একটির পর একটি চিহ্ন দেখাইতে লাগিলেন। স হাসিয়া বকুলাল বলিলেন, "জগৎ, ঐসব ভরং রাখিয়া দেও। হয়েছে কি না, তাই বল।

ধন্য স্নেহ। জগৎ কৃষ্ণ বিষ্ণু হইলে, বা না হইলে, বকুলালের কিছু যায় আসে না। তাঁহার প্রেম ঐ সব হিসাব নিকাশের অনেক উর্দ্ধে।

"কাল পাবনা যাবরে, বকু।"

"কালই ?" ভাবী বিরহ চিন্তিয়া বকুলাল রজনী কাটায়। তাঁহার নয়নের ধারা মুছিলে ফুরায় না।

সর্ব্বসুখ সান্ন্যাল

ট্রেন চলিতেছে। একটা মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীর প্রকোষ্ঠে এক কোণের দিকে বস্ত্রঢাকা দিয়া বন্ধুসুন্দর স্বীয় মৃগচর্ম্মাসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। কাহারও দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। গাড়ী মধ্যে এক দল যুবক নানাপ্রকার হাসি তামাসা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছে। বার্ডস্ আইএর ধোঁয়ায় গাড়ী যেন অন্ধকার হইয়াছে। কৃষ্ণনগর নিবাসী সর্ব্বসুখ সান্ন্যাল নামক একটি যুবকও সেই কামরাতে আছেন। যুবকটী বেশ বলিষ্ঠ ও নীতিবান। তিনি ঐ সকল উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের প্রতি কিছু নৈতিক উপদেশ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু কোন ফল হইতেছে না। "উপদেশোহি মুর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।"

যুবক দল চটিয়া উঠিল এবং উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বাড়িয়া চলিল। ক্রমে তর্ক বাঁধিল। তর্ক অবশেষে ভীষণ কলহের আকার ধারণ করিল। ক্রমশঃ উহা এমনভাবে তীব্রতর হইতে লাগিল যে, হাতাহাতি হইবার উপক্রম।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের নীরবতা ভঙ্গ হইল। কোলাহল শুনিয়া তিনি উঠিলেন এবং একটি অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে কলহরত যুবকদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। সে রূপ ও ভঙ্গী দর্শনে সকলে বিমোহিত হইল। তারপর যখন তিনি হাসি মাখা মুখে কৃপাবলোকন করতঃ কয়েকটি মধুর কথা উচ্চারণ করিলেন, তখন সকলে একেবারে জল হইয়া গেল। সেই অমিয়মধুর বাণী ও অনিন্দ্যসুন্দর রূপমাধুরী সর্ব্বসুখের প্রাণটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণ করিল। তিনি তখনই শ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া কয়েকটি সুমধুর উপদেশ দান করিলেন। সর্ব্বসুখ সকল সুখের মূল বন্ধুহরির ঐ অযাচিত স্নেহ লাভে নিজেকে কৃত কৃতার্থ মনে করিলেন। সর্ব্বসুখময়ের কৃপালাভে তাহার সর্ব্বসুখ নাম সার্থক হইল। বগুলা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে তিনি সেখানে অবতরণ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু নিজ দেহটাই কোনমতে তিনি সঙ্গে লইলেন, মনপ্রাণ প্রাণহারী দেবতার সঙ্গে সঙ্গে পাবনা চলিয়া গেল।

পাবনা পৌঁছিয়া ইচ্ছাময় প্রভু দিদি গোলোকমণির বাড়ীতেই যাইয়া উঠিলেন।

কীর্ত্তনোন্মাদনা

দেবী গোলোকমণির হারাণ রতন পাওয়ার মত আনন্দ। "দারিদ পাইল যেন ঘটভরা হেম।" পরম আদরাতিশয্যে স্নেহের ভাইটীকে গ্রহণ করিলেন। পাবনার প্রিয়জনেরা প্রাণ প্রিয়তম বন্ধুধনকে পাইয়া নবোদ্যমে কীর্ত্তনারম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন নাটুয়া ভাবাবেশে কীর্ত্তনের মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে জ্ঞানহারা হইয়া যাইতেছেন। কখনও দণ্ডবৎ পতিত হইতেছেন, গড়াগড়ি দিলে মনে হয় যেন শ্রীঅঙ্গের অস্থি সন্ধি সব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। ধূলায় লুটাইতে লুটাইতে সত্যসত্যই শ্রীহস্ত পদের অস্থি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গুটাইয়া যায়। একটা কুষ্মাণ্ড ফলের আকার ধারণ করে। দিদি এই ভয়ানক দৃশ্য সহ্য করিতে পারেন না। ভয়ে কাঁপেন, কখনও বা "কি হইল কি হইল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন।

দিদি জগতকে কীর্ত্তনে যাইতে দিতে চান না। জগত ঘরে থাকিবার পাত্র নয়, খোলকরতালের ধ্বনি কানে গেলে আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করিবার সামর্থ্য থাকেনা তার। একদিন নিকটস্থ একটি বাটীতে হরির লুট উপলক্ষে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। গোলোকমণি তাঁহার জগতকে রক্ষা করিবার জন্য ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। জগত তখন বালক নয়, বয়স তাঁহার বিশ ছাড়াইয়াছে। কিন্তু স্নেহময়ী গোলোকমণি তাঁহাকে সেই ছোট ভাইটিই মনে করেন। "জগত, আজ ওখানে কীর্ত্তনে যেতে পারবে না।" জগত দিদির কথায় মুখের

দিকে চাহিয়া হাসিলেন। সেই হাসিতে দিদির মন গলিল না। জগত যে তাঁহার কথা শুনিবে এমত ভাব তার মনে হইল না। তিনি তখন জগতের কোঠার দরজা টানিয়া বাহিরের দিকে শিকল দিয়া দিলেন। পার্শ্বের বাড়ীতে বন্ধুর প্রিয়জনরাই কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কীর্ত্তনের রোল যখন তুমুল হইয়া উঠিল, তখন দিদি শুনিলেন জগতের কোঠার মধ্যে দুপদাপ শব্দ হইতেছে।

দিদি জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলেন জগত সংকীর্ত্তনের তালে তালে নাচিতেছে ও ঢলিয়া পড়িতেছে। ঘরের মেজেতে গড়াগড়ি দিতেছে। নয়নের জল পীচকারীর ধারার মত ছুটিয়া ঘরের দেওয়াল ভিজাইতেছে। ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছে। কম্প হইতেছে—সোনার বর্ণ দেহখানি কেমন যেন কালো হইয়া যাইতেছে। সেই অত্যদ্ভুত দৃশ্য মনে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার করিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দরজা খুলিয়া জগতের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন প্রকারেই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে সমর্থ হইলেন না।

শেষে নিরুপায় হইয়া দিদি লোক পাঠাইয়া পার্শ্বের বাড়ী হইতে জগতের সঙ্গী কীর্ত্তনীয়াদের ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহারা মহানন্দে প্রাণ ভরিয়া গাইতে লাগিলেন,—

"গাওরে আনন্দ ভরে হরে কৃষ্ণ নাম।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বল অবিরাম॥"

কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ভাবনিধি বন্ধুসুন্দর প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই ঘটনার পর হইতে দিদি আর কখনও জগতকে কীর্ত্তনে যাইতে বাধা দেবার কথা মনেও আনিতেন না।

শিবের আনন্দ

ভক্তবর বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয় শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের পাবনায় আগমন সংবাদ পাইয়া নিজালয়ে আনিবার জন্য মনে মনে প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বৈদ্যনাথের বাড়ী আসিলেন। বুড়াশিব হারাণ ক্ষেপা চাকী মহাশয়ের বাড়ীর সিঁড়ির নীচে ছিলেন। অমনি "জগা এসেছিস্, জগা এসেছিস্ জগা এসেছিস্"···লক্ষ বার এই মন্ত্র জপিয়া ক্ষেপা বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

জগৎসুন্দরের দর্শনে সকলেরই আনন্দ, কিন্তু বুড়োশিবের যে আনন্দ তাহার আর তুলনা নাই। আনন্দ বস্তু যেন ঘনীভূত হইয়া তাহাতে মূর্ত্ত হয়। কত অঙ্গভঙ্গি, কত স্বরভঙ্গি করিয়া সে যে নাচে গায়, তাহা বর্ণনার অতীত। কখনও এক হাত তুলে, কখনও দুই হাত তুলে, কখনও বগল বাজায়, কখনও মালসাট মারে, কখনও ধূলায় গড়ায়, কখনও বালকবৎ হাসে, কখনও উন্মাদবৎ নাচে। ক্ষেপার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়। সে আনন্দের অভিব্যক্তি যে দেখে, সে আনন্দের ঘোষণা যে শুনে, সে-ই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রয়। শিবের আনন্দময় মহাভাবের ঘোষণাকে ভাষায় রূপ দিয়াই যেন ভক্তবর মহেন্দ্রজী লিখিয়াছেন,—

আনন্দে রহ আনন্দে রহ আনন্দে রহ ভাই ভগিনী।
আনন্দের রাজা আনন্দমোহন জগবন্ধু জগমণি॥

আনন্দের হাট আবার বসিবে,
স্বয়ং আনন্দ আনন্দ বিলাবে,
বিনামূলে মহা আনন্দ মিলিবে উঠে যাবে বিকিকিনি ॥
আনন্দের দেবতা আসছে নেবে কত,
আনন্দের মানুষ শত শত শত,
আনন্দময় হইবে ভূলোক কর জয় বন্ধুধ্বনি ॥
বুড়োশিবের আনন্দের আমন্ত্রণ জয়যুক্ত হউক।

"আমার জায়গা ছিল না"

"অহংকার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা"

—শ্রীবৃন্দাবন দাস

মোহান্ত সম্প্রদায় খ্যাতনামা কীর্ত্তনের দল হইয়া উঠিয়াছেন। কেবল ফরিদপুর সহর বা সহরতলীতেই নহে, ঢাকা, যশোহর, খুলনা, প্রভৃতি দূর দূর স্থানেও বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে আহুত হইয়া ইহারা গিয়া কীর্ত্তনাদি করেন। মূল কীর্ত্তনীয়া হরিদাস। মহিম, শ্রীমন্ত প্রভৃতি মৃদঙ্গ বাদক। বিশ পঁচিশ জন বাছা বাছা কীর্ত্তনীয়া। সবাই মিলিয়া প্রাণ খুলিয়া যখন শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত পদ গান করেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া হরিনাম কীর্ত্তনের মহাশক্তি উপলব্ধি করে। মোহান্ত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনে সত্যসত্যই শুষ্ক তরু মঞ্জুরিত হইয়া উঠে।

ফরিদপুর সহর হইতে কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে কৃষ্ণপুর নামক

একটি গ্রামে মোহান্ত ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুর রচিত গান হইতেছে।—

নিমাই চাঁদ নেচে যায় না
বয়ান ভাসে নয়ন ধারায়॥

বহু শ্রোতা চারিদিকে দাঁড়াইয়া বসিয়া মুগ্ধ হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ গানের তাল সুর কাটিয়া গিয়া একটা গোলমাল হইয়া কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল। হরিদাস বাদক-মহিমকে বলিলেন, "তোর বাজনার দোষে গানটা মাটি হইয়া গেল।" মহিম রাগিয়া বলিলেন, "তোমার গান ধরণের দোষেই সর্ব্বনাশ হইল। আমার বাজনা ঠিকই চলিতেছিল। তুমি এত কাল গান গাও, অথচ কিছুই ঠিক পাওনা।"

মহিমের কথায় হরিদাস চটিলেন। কথায় কথায় মহিম আরও চটিলেন। সমস্ত দলই যেন দুই ভাগ হইয়া গেল। মতান্তর শেষ পর্য্যন্ত গালাগালিতে পর্য্যবসান হইল। এইরূপ একটা নিতান্ত অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রোতৃবৃন্দ কীর্ত্তন দলের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে করিতে-চলিয়া গেলেন। কীর্ত্তনীয়ারাও বিষণ্ণ মনে সেই রাত্রেই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অনেক স্থানে অনেক প্রশংসা পাইয়া মোহান্ত সম্প্রদায়ের যে প্রতিষ্ঠা ও তৎসহ কিছু অভিমানের উদয় হইয়াছিল, দর্পহারী অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা চূর্ণ করিয়া দিলেন। ভক্ত-বৎসল ভক্তকে প্রতিষ্ঠার গর্ত্তে পতন হইতে রক্ষা করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতেই দুঃখীরাম ঘোষ আসিয়াছেন। হরিদাস ও মহিম উভয়কে নিদ্রা হইতে ডাকিয়া তুলিয়া তিনি

সংবাদ দিলেন,—"কাল শ্রীশ্রীপ্রভু পাবনা হইতে আসিয়াছেন। তোমাদের দুইজনকে এখনই ব্রাহ্মণকান্দা ডাকিয়াছেন। আসিতে বিলম্ব করিও না।" এই কথা বলিয়াই দুঃখীরাম চলিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া হরিদাস ও মহিম ব্রাহ্মণকান্দা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গত রাত্রের ঘটনায় এখন উভয়েই লজ্জিত। তবে জলের রেখার মত কাহারও মনে কোনও দাগ নাই। সাময়িক কোন মতান্তর হইলেও শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় উভয়ের হৃদয়ের স্থায়িভাব পরম ভক্তোচিতই।

পথে চলিতে চলিতে উভয়ে বলাবলি করিতে লাগিলেন। মহিম বলিলেন, "এত সকালে প্রভু ডাকিলেন কেন? কী মনে কর?"

হরিদাস বলিলেন, "আর কি মনে কর্‌ব। কালকার রাত্রের ঘটনা টের পাইয়াছেন তাই!"

মহিম বলিলেন, "তা কিরূপে সম্ভব? কাল রাত্রে কেষ্টপুরে যাহা ঘটিয়াছে, প্রভাত হইতে না হইতেই ব্রাহ্মণকান্দা বসিয়া প্রভু তাহা কিরূপে জানিবেন? আমার মনে হয় কেবল পাবনা হ'তে এলেন, কীর্ত্তনাদি অন্য কোন প্রয়োজনে ডাকিয়া থাকিবেন।"

হরিদাস গম্ভীরভাবে বলিলেন, "শোন মহিম, একদিনকার একটা ঘটনা বলি। সকাল বেলা ঘরে বসিয়া প্রভাতী কীর্ত্তন করিতেছি। সেই সময় ওপাড়ার বিহারী আসিল, কি যেন কাজে। তার কাছে ছিল আমার টাকা পাওনা। তাকে দেখিয়াই কীর্ত্তন থামাইয়া টাকা চাহিলাম। পাওনা টাকা দিতে

দেরী করিতেছে বলিয়া দু'চারটা কড়া কথা বলিলাম। তারপর সে চলিয়া গেলে, আবার করতাল লইয়া কীর্ত্তন শেষ করিলাম। এই ব্যাপারের ঘণ্টা তিনেক পরেই কোনও প্রয়োজনে ব্রাহ্মণকান্দা যাই। প্রভু আমাকে দেখিয়াই, ঐরূপ ভাবে কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া কথা বলার জন্য তীব্র শাসন করিলেন। আমি মাথা নীচু করিয়া রহিলাম। প্রভু নীরব হইলে কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রভু ঐ সময় আপনি কোথায় ছিলেন? প্রভু বলিলেন "তোর ঘরের বেড়ার সঙ্গে যে ছবিটা টাঙ্গান আছে, তারই মধ্যে।"

কথা শুনিয়া মহিম বলিলেন, "তা, ভাই, কাল্‌কের রাত্রের কীর্ত্তনে তো প্রভুর কোন ছবিও ছিল না।" হরিদাস কহিলেন, তাতে কি হইল? প্রভুর ছবি ছিল না, রাধাকৃষ্ণের ছবিতো ছিল। ও একই কথা।"

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে দুইজনে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমন্দিরের ও প্রভুর গৃহের সম্মুখে ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবৎ করিয়া দুইজনেই বসিলেন। একটু পরেই গৃহমধ্য হইতে বন্ধুসুন্দর অতি কাতরভাবে বলিলেন, "হারে হরিদাস! কাল রাত্রে এত বেদনা দিলি কেন রে? কীর্ত্তন আমার জীবন। আমার জীবনের উপর আঘাত করলি! সারা রাত যন্ত্রণায় ছটফট কর্‌ছি রে! ওঃ কি কষ্ট!

হরিদাস মনে করিয়াছিলেন, প্রভুর ক্রোধের মূর্ত্তি দেখিবেন ও শাসনপূর্ণ কথা শুনিবেন। এমন কারুণ্যের বিগ্রহ ও এত কাতরোক্তি যে শুনিতে পাইবেন, তাহা কল্পনা করিতে পারেন

নাই। কী যে উত্তর করিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীপ্রভু তখন ঘরের দরজা একটু ফাঁক করিয়া আরও কাতর ভাবে বলিলেন, "হরিদাস! অমনি ক'রে কি নিতাইয়ের অঙ্গে আঘাত কর্‌তে আছে! মহিম! তুই সীতানাথের পাঁজর ভেঙ্গেছিস্। আমি আর নাই।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর কথাগুলির মধ্যে এতই বেদনামাখা ছিল যে, হরিদাস ও মহিম উভয়েই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কান্দিতে কান্দিতে দুইজনেই ধূলায় লুটাইয়া "প্রভু অপরাধ ক্ষমা কর" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। উভয়ের হেচ্‌কী উঠিয়া গেল। শ্রীশ্রীপ্রভু তখন গৃহাভ্যন্তর হইতে পিঁড়ায় নামিয়া দুইজনের মস্তকে পদ্মহস্ত স্পর্শ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলে অতি ধীরে বলিলেন, "নিত্য নিরভিমানে কীর্ত্তন করিবে। অহংকার চিরত্যাগ করিবে। আজ সন্ধ্যায় সদলে আসিয়া তুমুল কীর্ত্তন করতঃ অপরাধের ক্ষালন করিবে।"

মহিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, কালরাত্রে কীর্ত্তন নষ্ট হইয়াছিল কি গানের দোষে না বাজনার দোষে?" প্রভু বলিলেন, "তোর বাজনার দোষ। তোর পেট পোরা গুণ। তাল কেটে ফেলিস্।" মহিম বলিলেন, "প্রভু, আপনি তখন কোথায় ছিলেন?" মৃদু হাসিয়া বন্ধুসুন্দর উত্তর করিলেন, "তোদের সঙ্গেই।" মহিম তখন অতি আব্দারের সুরে বলিলেন, "প্রভু সঙ্গে ছিলেন, তবে কৃপা করিয়া বাজনা যাতে ঠিক হয় সেরূপ শক্তি দিলেন না কেন?" মহিমের কথায় শ্রীশ্রীবন্ধুহরি

অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "তোর হৃদয়ে অহংকার হয়েছিল, তাই আমার জায়গা ছিল না।" প্রভুর কথায় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মহিম যুক্তকরে বলিলেন, "প্রভু, অহংকার তো চিরদিনের জন্য চূর্ণ ক'রেছেন, এখন যা'তে বাজা'তে পারি সেই শক্তি দেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু তখন গৃহ হইতে একখানি ক্ষুরে শাণ দেবার পাথরখণ্ড আনিয়া মহিমকে দিয়া বলিলেন, "এই নে, কোথাও কীর্ত্তনে যাবার আগে সীতানাথকে স্মরণ ক'রে এই পাথরে হাত ঘস্‌বি, তা হ'লেই হাত ঠিক হয়ে যাবে।" মহিমচন্দ্র দুই হাত পাতিয়া পাথরখানি লইয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেন এবং চিরকালের জন্য প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। ক্রমে তাঁহার মৃদঙ্গের হাত এত মধুর হইয়াছিল যে, যে শুনিত সে-ই মুগ্ধ হইত। মহিমের মৃদঙ্গ বাদ্যে উৎফুল্ল হইয়া স্বয়ং প্রভুই একদিন বলিয়াছিলেন, "মহিমের হাতে সীতানাথের কৃপাদৃষ্টি প'ড়েছে।"

সেদিন বিদায় হইবার কালে হরিদাস শ্রীশ্রীপ্রভুর কাছে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভু, করতাল যে কয়েক জোড়া দিয়াছেন, তাহা সবই বিলি হইয়া গিয়াছে। আরও দশ বার জনে করতাল চায়।"

"পাবে, ক'দিন পর", বলিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু আশ্বাস দিলেন।

মহিমচন্দ্রের আত্মজ শ্রীমান বিজয় মোহন্তের নিকট শ্রুত আছি যে, কোথাও কীর্ত্তনে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার বাবা ঐ পাথরে হাত না ঘসিয়া কোনদিনই গৃহের বাহির হইতেন না। মহিমের

দেহরক্ষার পরেও ঐ পাথর কিছুদিন তাঁহাদের ঘরে ছিল। একবৎসর জল প্লাবনে উহা হারাইয়া যায়। বিজয় মোহন্তও ওস্তাদ মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। বিন্দুমাত্র অভিমান তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহার বৈষ্ণবতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। একদিন তাঁহার বাজনার কেহ প্রশংসা করিলে, বলিতে শুনিয়াছি, "প্রভুর দেওয়া বাবার পাথরে হাত ঘ'সেছি, তাই।"

ডোম পল্লী

"কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া"

—শ্রীবাসু ঘোষ

কয়েকদিন পর একদিন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর প্রতাপ ভৌমিক মহাশয়কে ডাকিয়া কয়েক জোড়া করতাল ও অন্যান্য কতিপয় জিনিষের ফর্দ্দ লিখিয়া দিয়া বলিলেন, "প্রতাপ, কলিকাতা যাও। এই সব জিনিষ লইয়া আসিবে। ভাল করতাল না পাইলে নবদ্বীপ হইয়া আসিবে।"

যাত্রা করিবার কালে প্রতাপচন্দ্র দেখিলেন, প্রভু দরজা বন্ধ করিয়া আপন মনে নীরবে বসিয়া আছেন। ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া প্রতাপচন্দ্র ধীরে ধীরে কহিলেন "কলিকাতা রওনা হইতেছি। গিয়া কোথায় উঠিব, বলিয়া দিলে ভাল হইত। সে-বারে অসুবিধা হইয়াছিল। বকুর মেছে যাইতে ত নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।" একটু পরে ঘরের ভিতর হইতে

একখানি কাগজ বাহিরে আসিয়া পড়িল। তাহাতে লেখা আছে, "রামবাগান। ডোম পল্লী। দয়াল তিনকড়ি॥"

কাগজখানি মাথায় ছোঁয়াইয়া সঙ্গে লইয়া প্রতাপচন্দ্র যাত্রা করিলেন। ঐ লেখাগুলির কোন অর্থবোধ তাঁহার হইল না। হেয়ালীর মত লাগিল। কলিকাতায় গিয়া প্রভুর লিখিত ফর্দ্দ অনুযায়ী করতাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রতাপচন্দ্র প্রভুর লিখিত কাগজখানি আর একবার পড়িলেন। তখন কিছু অর্থবোধ হইল। রাম বাগান কোথায়, কাহারও কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, উহা কোন বাগানের নাম নয়, পরন্তু কলিকাতা একটি অঞ্চলের নাম। চিৎপুর বিডন ষ্ট্রীটের নিকটে উহা অবস্থিত, মানিকতলা ষ্ট্রীট ধরিয়া সেখানে যাওয়া যায়। ঐ ষ্ট্রীটে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই প্রতাপচন্দ্র বুঝিলেন, ওখানে ডোমদের একটি পল্লী আছে। তিনি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পল্লীতে প্রবেশ করিয়া প্রতাপচন্দ্রের মনে হইল, তিনি যেন কলিকাতা সহর পরিত্যাগ করিয়া একটা গণ্ডগ্রামে ঢুকিলেন। রাস্তা ঘাট অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন। ঘন ঘন বস্তী। ঝুপড়ি ঝুপড়ি খোলার ঘর। রাস্তায় নগ্ন, অর্দ্ধনগ্ন ধূলিকাদা মাখা বালকদল। বহু কর্ম্মঠ যুবক সুধার লৌহাস্ত্র দ্বারা বেত আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করিতেছে, কেহ বা বেতের ঝুড় তৈয়ারী করিতেছে।

আড়ম্বরহীন মলিন বসনা, অর্দ্ধাবৃত গাত্রা প্রৌঢ়া মেয়েরা পাঁচজন সাতজন এক এক স্থানে বসিয়া বাঁশের চুপড়ি, ডালা, কুলা তৈয়ার করিতেছে। তাহাদের চোখে মুখে সরলতা

মূর্ত্তিমন্ত। সহরের কৃত্রিমতার হাওয়া বাতাস, ভোগ বিলাস, কর্ম্মব্যস্ততা সেখানে বিন্দুমাত্রও প্রবেশ করে নাই। প্রতাপ পল্লীতে প্রবেশ করিয়া একটা গলির কোণে দাঁড়াইলেন। কলিকাতা সহরের কেন্দ্রস্থলে গ্রাম্য দৃশ্যে তিনি আকৃষ্ট হইলেন।

প্রতাপচন্দ্র সুপুরুষ। গায়ের রংটি সুন্দর গোলাপী, পরিধানে স্বচ্ছ শুভ্র ধবল বসন। সাত্ত্বিকতা যেন দেহ ধরিয়াছে। তিনি দাঁড়াইতেই এককালে অনেকগুলি চোখের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পতিত হইল। চারি পাঁচজন লোক তাঁহার কাছে আগাইয়া আসিল। কি চান, কোথায় থাকেন, তাহারা যেন জিজ্ঞাসা করিতে চায়। কিন্তু সঙ্কোচে সাহসী হয় না। প্রতাপচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "এখানে তিনকড়ি নামে কেহ আছেন?" "হাঁ আছেন" বলিয়া একযোগে পাঁচ ছয়জন তাঁহাকে তিনকড়ি ডোমের ঘর দেখাইয়া দিল। দুই তিনজন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে অগ্রসর হইল। দূর হইতেই কেহ "তিনকড়ি", কেহ "তিনু" কেহ বা "মামা" বলিয়া হাঁক দিল। চারিদিকে ছেলে মেয়ের দল ভিড় করিল। প্রতাপচন্দ্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ছোট একটা ঘর হইতে একজন বলিষ্ঠ যুবক বাহির হইল। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, হাসি খুসী মুখ। দৃষ্টির মধ্যে একটা আপন-করা ভাব। কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত, দীন বেশ। ব্যবহার বিনয় নম্র। একজন বলিল, "এই যে তিনকড়ি, তোমাকে খুঁজ্‌ছেন ইনি।"

"আমাকে কেন?"

"আপনি তিনকড়ি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তিনকড়ি মাঝি। আপনি?

"আমি অতিথি।"

"আমার নাম কিরূপে জানিলেন ?"

"প্রভু জগদ্বন্ধু আপনার নাম জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি আমাকে আজ এই রামবাগান ডোম পল্লীতে আপনার কাছে থাকিবার আদেশ দিয়াছেন।"

"প্রভু জগদ্বন্ধু" "প্রভু জগদ্বন্ধু" তিনকড়ি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহার শরীর কণ্টকিত হইল। চোখের বহমান জলধারা তিনকড়ি কাঁধের গামছাখানা দ্বারা মুছিলেন।

"আপনি প্রভুকে জানেন ?"

"জানি কি করিয়া বলিব! দেখা দিয়াছেন, তাই দর্শন করিয়াছি। আপনি প্রভুর লোক! আহা, প্রভুর কি দয়া!

তিনকড়ি বলিলেন, "আসুন, কৃপা করিয়া যখন আসিয়াছেন, আমার ক্ষুদ্র কুটিরে আসুন।" প্রতাপচন্দ্র তিনকড়ির সঙ্গে তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনকড়ির পত্নী ও ভগ্নী আসিয়া পরম ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন। তিনকড়ি প্রতাপচন্দ্রকে নিজ গৃহমধ্যে খানিকটা স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিলেন", এই স্থানটিতে প্রভু শয়ন করিয়াছিলেন। আমরা এখানে শুই না বা কখনও মাড়াই না। আমার ভগ্নী প্রত্যহ এখানে ধূপধূনা দেন। স্থানটিতে তাঁহার গায়ের অপূর্ব্ব গন্ধ এখনও লাগিয়া আছে। প্রভু কোনও শয্যা নিলেন না। দুইখানা কঠিন বাঁশের তালাইয়ের উপর শয়ন করিয়া থাকিলেন। আমরা পতিত তাই কৃপা করিয়া আসিয়াছিলেন।" বলিতে বলিতে তিনকড়ি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ঘরের মধ্যে একপার্শ্বে কতকগুলি আটা সোটা সাজান ছিল। তিনকড়ি প্রতাপচন্দ্রকে সেইগুলি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "এই দেখুন এই জিনিষগুলি, সব দস্তার তৈয়ারী ছিল। প্রভুর আদেশে আমি নিজে কিনিয়াছি। তারপর প্রভু শ্রীচরণ স্পর্শ দিয়া এগুলি সব খাটি রূপা করিয়া দিয়াছেন। হতভাগা আমি বলিয়াছিলাম, প্রভু, আমি গরীব, আপনার সেবা কি দিয়া করিব? তাই তিনি আমার সাত আট মণ দস্তার মাল রূপা করিয়া দিয়া গেলেন।"

প্রতাপচন্দ্র তিনকড়ির কথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার প্রভু ইচ্ছা করিলে চরণস্পর্শে দস্তাকে রূপা কেন হীরা জহরৎও করিতে পারেন, এ বিশ্বাস প্রতাপচন্দ্রের আছে, কিন্তু প্রভু যে সত্যই ঐরূপ একটা বুজরুকী করিয়াছেন ইহা তাঁহার মনে হইল না। ভাবিলেন, ইহার মধ্যে কোন রহস্য থাকিবে। কিন্তু সরল বিশ্বাসী তিনকড়ির সঙ্গে ইহা লইয়া কোন বাদ প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা করিলেন না। গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়াই প্রতাপচন্দ্র অনুভব করিলেন,—তিনকড়ি সত্যই বলিয়াছে—প্রভুর ব্যবহৃত স্থানটি হইতে সত্যসত্যই তাঁহার প্রাণমনোহারী অঙ্গগন্ধ বাহির হইতেছে। তিনি তিনকড়িকে বলিলেন, "আপনি পরম ভাগ্যবান, আপনার উপর প্রভুর কৃপা অসীম। নিজ হস্তে তাই আপনার নাম লিখিয়া "দয়াল" বিশেষণ দিয়াছেন।" এই বলিয়া প্রতাপচন্দ্র সেই শ্রীহস্তলিখিত কাগজখানি বাহির করিয়া তিনকড়িকে দেখাইলেন।

তিনকড়ি লেখাপড়া জানেন না। দুই হাতে কাগজখানি তুলিয়া মাথায় বুকে ধরিয়া বলিলেন, "আমার মত হতভাগাকে ভাগ্যবান বলিতেছেন! প্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না। সকালবেলা প্রভুকে হারাইলাম। কোথায় যে তিনি কি ভাবে চলিয়া গেলেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সেই অবধি নিদারুণ বেদনা লইয়া দিন কাটাইতেছি। ঐ সব রূপার জিনিষগুলি রাখিয়া দিয়াছি। যদি কোন দিন আবার তিনি তেমনি অযাচিত ভাবে আসেন, তবে ঐ গুলি বিক্রয় করিয়া তাঁর সেবা করিব। আপনাকে পাইয়া মনে আনন্দ হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন তাঁরই প্রতিনিধি এসেছেন। বিশেষতঃ, তিনি যখন এ হতভাগ্যের নাম করিয়া লিখিয়া আপনাকে পাঠাইয়াছেন তখন বুঝিলাম, তিনি ভুলেন নাই।"

বলিতে বলিতে তিনকড়ির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রতাপ তিনকড়ির ভক্তিভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন—"প্রভু কি কখনও ভক্তকে ভুলিতে পারেন।" তিনকড়ি বহু কষ্টে বলিলেন, "ভৌমিক মহাশয়, আমি ভক্ত নই, পতিত—নিতান্তই পতিত।"

প্রতাপচন্দ্র সেই রাত্র সেখানে বিশ্রাম করিলেন। শয়ন করিয়া প্রতাপ শুনিতে পাইলেন, বহুলোক মদ খাইয়া মাতলামি করিতেছে। তিনকড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হল্লা করিতেছে, ইহারা কারা?" তিনকড়ি বলিল, "আমাদের ডোমপাড়ারই লোক।" প্রতাপ বলিলেন, "ইহারা মদ খায়?" তিনকড়ি উত্তর করিল "হ্যাঁ খায়, আরও কত কি করে। আমিও খাইতাম,

কত অপকর্ম্ম করিতাম। প্রভুর পাদোদক পান করিয়া সব নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। জানিনা, আবার কবে আসিয়া প্রভু আমাদের গোষ্ঠির সবাইকে পাদোদক দানে উদ্ধার করিবেন।" তিনকড়ির কণ্ঠ আবার বাষ্পরুদ্ধ হইল। পর দিন প্রভাতে বিদায় গ্রহণ কালে প্রতাপচন্দ্রের চারিদিকে ডোমপাড়ার নরনারী অনেকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই যেন জানিতে চায়, প্রভু আবার কবে আসিবেন। প্রতাপচন্দ্র দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"শীঘ্রই আসিবেন।" শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আবেগভরা কণ্ঠে তিনকড়ি প্রভুকে প্রাণের নিবেদন জানাইবার জন্য প্রতাপচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ কহিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর ফর্দ্দমত ক্রীত দ্রব্যাদি লইয়া প্রতাপচন্দ্র যথা-সময় ব্রাহ্মণকান্দা পৌঁছিলেন। মনে ইচ্ছা, প্রভুকে সব কথা বলিবেন, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে আর সুযোগ পাইলেন না।

গোকুলানন্দ

"গুরু অভিপ্রেত কার্য্যকে গুরুদীক্ষা বলে।"

—শ্রীবন্ধুসুন্দর

অপরাহ্ণ বেলা ব্রাহ্মণকান্দার পুকুর পারে একটা আম্রবৃক্ষে হেলান দিয়া বন্ধুসুন্দর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। অর্দ্ধ উন্মুক্ত ফুলের অঙ্গখানি হইতে চাঁদের সুধা গলিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে লোকজন বেশী কেহ নাই। প্রতাপচন্দ্র ময়ূরপুচ্ছের ব্যজনীখানি ধীরে শ্রীঅঙ্গোপরি সঞ্চালন করিতেছেন। হঠাৎ

পদ্মআঁখি উন্মীলন করিয়া, প্রতাপের দিকে চাহিয়া, প্রাণারাম প্রভু কহিলেন—"প্রতাপ, যুগলকিশোর ভজন কর।"

প্রতাপ। ভজন কি তা ত জানি না, শিখিয়ে দেন।

প্রভু। যুগলের প্রতি মানসে যে যে কার্য্য ও আচরণ তাহাকেই ভজন কহে।

প্রতাপ। মানসে কি কি কার্য্য আচরণীয় ?

প্রভু। মানসে সদা যুগল সঙ্গ। নিজেকে "অমুক" দাসী মনে করিবে। কৃষ্ণকান্তি নয়নে ও মানসে সদা ভাবিবে। কৃষ্ণই জীবন সর্ব্বস্ব। কৃষ্ণ গতি ও কৃষ্ণ পতি এই সার করিবে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ জীবন ব্রত করিবে। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য জানিবে না। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই লিখিবে ভাবিবে, জানিবে, জপিবে, কাঁদিবে।

কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীপ্রভু থামিয়া গেলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে ধীরে বলিতে লাগিলেন।

"বৃন্দাবন তিন প্রকার। নিত্য বৃন্দাবন। লীলা বৃন্দাবন ও ধাম বৃন্দাবন। নিত্য বৃন্দাবনে একা কৃষ্ণ আছেন, সখা সখী কেহই নাই। লীলা বৃন্দাবনে যুগল কিশোরের নিত্য লীলা হইয়া থাকে। ধাম বৃন্দাবন—কাম্যবন হইতে মান সরোবর পর্য্যন্ত চৌরাশি ক্রোশ ব্যাপী। যেখানে সকলে যাইয়া থাকে। লীলা বৃন্দাবনই ভজনীয় জানিবে। অহোরাত্রই ব্রজ স্মরণাবেশে স্থিতি।"

যেখানে সখা সখী কেহই নাই একক শ্রীকৃষ্ণ আছেন, এমন একটী কৃষ্ণ স্বরূপের কথা শুনিয়া প্রতাপচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট বস্তুটিই বোধহয় সে-ই হইবেন। প্রভুবন্ধু

অমনি বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে কহিলেন, "ধারণার অতিরিক্ত বিষয় চিত্ত হইতে সযত্নে দূর করিতে হয়। নিত্য বৃন্দাবনের কথা ভাবনায় আনিতে নাই।"

প্রতাপচন্দ্রকে তখন কাগজ-কালি আনিতে আদেশ করিলেন। উহা আনীত হইলে শ্রীহস্তে লেখনী লইয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিলেন,—

"পিতা—বৃষভানু রাজা	সেবা—রাই
মাতা—কৃত্তিকা	দশা—ললিতা
শ্বশুর—নন্দরাজ	সাধন—কীর্ত্তন
শ্বাশুড়ী—যশোদা	ভজন—মালাজপ
পতি—কৃষ্ণ	স্মরণ—যুগলমিলন
গতি—গৌর	দর্শন—গৌর
গুরু—বন্ধু	পঠন—প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা"

লিখিয়া বলিলেন, "প্রতাপ, তোমার স্বরূপতঃ নাম গোকুলানন্দ দাস, ইহা গুপ্ত রহিবে। নিত্য গ্রন্থপাঠ করিবে। নিত্য পাঠে মানস চৈতন্য হবে।" তৎপর কতিপয় গায়ত্রী ও মন্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। পরে লিখিলেন, "স্থিরচিত্তে, যে যে বিগ্রহ সেই সেই বিগ্রহের মন্ত্র, সেই সেই বিগ্রহের বেষ্টনে, গোলাকার, স্বর্ণাক্ষরে, উজ্জ্বল, তেজোময়, সুদর্শন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মধুর চিন্তা করিবে।"

খাতাটির উপরে লিখিলেন "শ্রীমতি।" তাহার নীচে লিখিলেন, "গুরু জগদ্বন্ধু। শিষ্য গোকুলানন্দ।" শ্রীহস্তলিপি অঙ্কিত খাতাটি মাথায় লইয়া প্রতাপচন্দ্র নাচিতে লাগিলেন। রঙ্গলালের রঙ্গের খেলা সবই নিরুপম।

শ্রীহরকুমার রায়

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।" —বিশ্বকবি

শ্রীশ্রীপ্রভু প্রতাপচন্দ্রকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, প্রতাপচন্দ্র প্রভুকে লইয়া কোথায় উঠিবেন ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণে ইচ্ছা জাগে প্রভু রামবাগানে যান কিন্তু তিনি নিজে রামবাগানের যে অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ঐ স্থানে প্রভুকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। ওখানে গেলে প্রভুর অনেক কষ্ট হইবে এই ভাবিয়া তিনি কোন কথা বলিতেছেন না, এমন সময় শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "তুমি ৬৭ নম্বর চাষাধোপাপাড়া হরকুমারের বাড়ী যাও। আমি এখানে প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করি।" এই বলিয়া ইংরাজীতে লিখিলেন—

Harakumar Roy
67, Chasadhopapara Lane, Jorasanko, Simla.

প্রতাপ গঙ্গাজল ছিটাইয়া সঙ্গে আনীত ছোট তুলসীবৃক্ষটি পার্শ্বে দিয়া প্রভুর বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। মৃগচর্ম্মাসনে প্রভু সেখানে বসিলেন। তাঁহারই ইঙ্গিতে ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীসারদা বাবু সেই বিশ্রাম প্রকোষ্ঠের বাহির হইতে তালা দিয়া রাখিলেন। এই ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীশ্রীপ্রভুর গতিবিধি জানিতেন ও অন্তরের সহিত সুগভীর শ্রদ্ধা করিতেন।

প্রতাপচন্দ্র চাষাধোপাপাড়া হরকুমার রায়ের খোঁজে

চলিলেন। প্রতাপ ঐ পাড়াও চিনেন না; ঐ ব্যক্তিকেও চিনেন না। সিমলা, জোড়াসাঁকো অনেক অনুসন্ধানে ঐ পাড়ার খোঁজ মিলিল। প্রভুর দেওয়া ঠিকানামত জুয়েলার হরকুমার রায়ের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। সংবাদ দিতেই একজন বর্ষীয়ান যুবা পুরুষ বাহিরে আসিলেন। 'প্রভু আসিয়াছেন' এই সংবাদে তাঁহার যে আনন্দের উদয় হইল তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব। তাঁহার মুখখানি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। চক্ষু ফাটিয়া জল গড়াইল। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। দেহ কাঁপিতে লাগিল। প্রতাপচন্দ্র অবাক হইয়া রহিলেন। প্রভুর সংবাদেই এত আনন্দ! প্রতাপ অনুমানে বুঝিলেন—ইনিই হরকুমার রায়। কত অজানা অচেনা লোক প্রভুবন্ধুকে কত ভালবাসে দেখিয়া প্রতাপ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন।

একটী ছোট একতালা দালানে শ্রীশ্রীপ্রভুর থাকিবার স্থান হইল। গঙ্গাজল দ্বারা সমস্ত ঘর পুনঃ পুনঃ ধোয়াইয়া হরকুমার তাহা ধূপ গন্ধী বাসিত করিয়া নিজেই ষ্টেশনে গিয়া একখানি সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ীতে শ্রীশ্রীপ্রভুকে যথা নির্দ্দিষ্ট গৃহে লইয়া আসিলেন। শ্রীহস্তে হরকুমারকে লিখিয়া দিলেন,

"মানব-জন্ম পাপ করিবার জন্য নহে, কৃষ্ণ-সেবার জন্য। ভোগ-বিলাস ত্যাগ। নিত্য টহল।"

"কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
রাধা মাধব রাধিকা নাম॥"
করতালনে সহর পরিভ্রমণ।

ভৌমিক মহাশয় রামবাগানে প্রভুর সংবাদ দিলে তাহারা

সবাই আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে ছুটিয়া আসিলেন। সকলে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, কাঙ্গালদের পাড়ায় চলুন।" গৃহাভ্যন্তর হইতে উত্তর আসিল, "সবাই কীর্ত্তন শিখিলে, যাইব।" প্রতাপকে বলিলেন—"হরিদাসকে আজই আসিতে পত্র দেও। তোমরা দু'জনে ইহাদের কীর্ত্তন শিখাইবে। ছোট বড় বাছিবে না।"

প্রভু রামবাগানে যাইবেন, এইজন্য সকলেরই কীর্ত্তন শিক্ষা করিতে আগ্রহ জন্মিল। তিনকড়ি তাহার ভাগিনেয় শ্রীমান হরিদাস কাঁশারীকে প্রভুর গৃহের দরজার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, বলিলেন, "প্রভু, এই আমার ভাগিনেয় হরিদাস একটু গাইতে বাজাইতে পারে। আপনি কৃপা করিলে ধন্য হইবে।" ভক্তের আগ্রহে ভক্তবৎসল দরজা একটু ফাঁক করিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন। সে অনিন্দ্য-সুন্দর বদনচন্দ্র দর্শনে সকলেরই একরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা। হরিদাসের উপর কারুণ্যপূর্ণ কৃপাদৃষ্টিপাত হইল।

দু'চার দিন মধ্যেই, ফরিদপুর হইতে পত্র পাইয়া হরিদাস মোহান্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, বন্ধুহরি শ্রীশ্রীব্রজধামে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। হরকুমার যাতায়াতের টিকেট কিনিয়া দিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় তুলিয়া দিলেন। গাড়ীর কামরাটি, বসিবার গদীটি, প্রতাপচন্দ্র প্রভুর অভিপ্রায় অনুযায়ী গঙ্গাজলাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া দিলেন। শীঘ্রই ফিরিবেন, এই আশ্বাস দিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু একাকীই ব্রজাভিমুখে চলিলেন।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

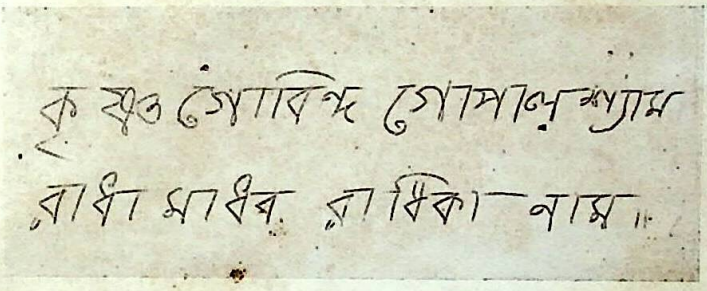

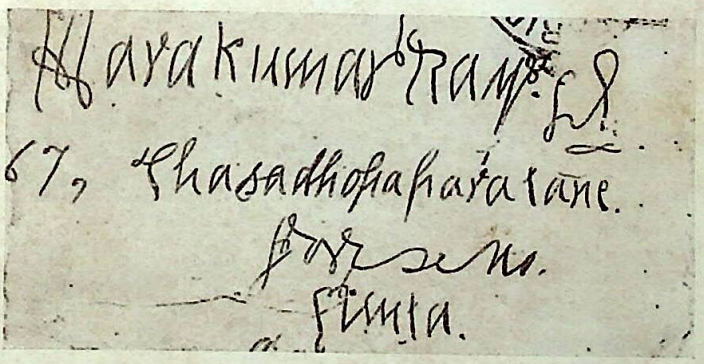

শ্রীহস্তলিপি

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

আড়া মেছ বাড়ী

অরুণ ঈক্ষণে সখী, মোরে দেখিল নিরখি,
সে চাহনী সদা জাগে মনে।
(পাশরিতেও নারি মা) (মানস ধসিয়া র'ল)
(নৈরাশ্যই সার হ'ল)

—শ্রীবন্ধুসুন্দর

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর আড়া ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। অতুলচন্দ্র চম্পটী সেখানে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। পূর্ব্বে সপরিবারে বাসা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে পারিবারিক প্রয়োজনে ক্ষীরোদা সুন্দরী পাটনাতে অতুলচন্দ্রের ভ্রাতা অমূল্য চম্পটীর বাসায় অবস্থান করিতেছেন। প্রয়োজন না থাকায়, অতুলচন্দ্র বাসা ছাড়িয়া মেছ বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু শেষরাত্রে আড়া ষ্টেসনে নামিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে মেছ বাড়ীতে পৌঁছিলেন। অতুলচন্দ্রের দুয়ারে দুইটি টোকা দিলেন। অতুলচন্দ্র উঠিয়া দুয়ার খুলিলেন। শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে দুইজনের দেখা হইল। পূর্ব্বে আরও অনেকবার দেখা হইয়াছে। কিন্তু, সেদিন যেমন দেখার মত দেখা হইল, এমনটি যেন আর কোনও দিনই হয় নাই। "কিক্ষণে হেরিনু গোরা, নবীন কামের কোঁড়া, সে অবধি রইতে নারি ঘরে।"

প্রভাত হইতেই অতুলচন্দ্রের ভাবান্তর সকলের লক্ষ্যের বিষয় হইয়া পড়িল। তিনি কাহারও সহিত স্পষ্ট করিয়া কথা বলিতেছেন না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, মুখে

অঙ্গুলি দিয়া চুপ করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। তাঁহার মুখ-মণ্ডলে একটা অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য নামিয়াছে। অথচ ব্যবহারে ও বাক্যে হর্ষও ফুটিয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দুইটি বর্ষণোন্মুখ। সকল কার্য্যেই একটা ত্রস্ততা। তাঁহার চালচলন ক্ষুদ্র মেছ বাড়ী ও তাহার বাসিন্দাগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কাহাকে কখন কি ফরমাস করেন তাহার ঠিকানা নাই। প্রধান শিক্ষক হিসাবে সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। তিনি আজ অতি চঞ্চল—অথচ গম্ভীর। ব্যাপারটা সবাই অনুমানে কিছু কিছু বুঝিতেছেন।

অতুলচন্দ্র তাঁহার ছোট মামা-শ্বশুরটির কথা অনেকবার অনেকের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। সকলেরই অনুমান, তিনি আসিয়াছেন। অতুলচন্দ্র পুনঃ পুনঃ ঘর-বাহির করিতেছেন। প্রত্যেকবারেই ঘরের দরজাটি বন্ধ করিতেছেন। মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে অতি নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কৌতূহল অদম্য হইলেও ব্যাপারটি যে কি তাহা কেহই অতুলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইতেছেন না।

অন্যদিকে, অতুলচন্দ্র নিজেও বুঝিতেছেন না, এবার কেন অকস্মাৎ তাঁহার মধ্যে এত সম্ভ্রম এত গাম্ভীর্য্য, এত চঞ্চলতা, এত অসচ্ছন্দতা একত্রে আসিয়া তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই ছোটমামা জগদ্বন্ধু আসিয়াছে, তাঁহাকে তো তিনি পূর্ব্বে কত দেখিয়াছেন। তা ছাড়া বড় স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে অমন কত কিশোরকে তিনি প্রত্যহ শাসন করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও

ছোটমামা জগৎসুন্দর বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে আড়ার বাসাবাটীতে আসিয়াছিলেন। তখন সকলে স্বচ্ছন্দে মহানন্দে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আজ এ কী হইল!

জগৎসুন্দর অতুলচন্দ্র হইতে সম্পর্কে বড় হইলেও বয়সে ছোট। অতুলচন্দ্র এপর্য্যন্ত কোন দিনই তাঁহাকে অতি-সম্ভ্রম করেন নাই। বরং অনেক সময় বন্ধুসুন্দরের সাত্ত্বিক আচরণ ও হরিনাম নিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যকে হাসি তামাসা করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আর আজ সেই জগৎ মামা এক অদ্ভুত ভাব-গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্বসহ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করিয়া একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মহীয়ান মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

অতুলচন্দ্র সমস্ত বাড়ীটা ধোয়াইয়া পরিষ্কার করিয়াছেন। স্নানের জন্য পরিষ্কার পাত্রে জল রাখিয়াছেন। অনেক ফল ও বাজারের দ্রব্যাদি আনাইয়াছেন। স্কুলে যে আজ আর যাওয়া হবে না তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছেন। তবে কাহাকে দিয়া কিভাবে সেদিনকার স্কুলের কাজ করাইবেন তাহাই চিন্তা করিতেছেন। ঘরের মধ্যে তখন মৃদু করতালির শব্দ শোনা গেল। "হরেকৃষ্ণ, আপনি একবার এদিকে আসুন।"

প্রভুবন্ধুর মধুর আহ্বানে অতুলচন্দ্র নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু কহিলেন, "আপনার স্কুলের বেলা হইতেছে, আপনি যান। আমাকে কিছু আতপ চাউল, ঘৃত, সিদ্ধ করিবার তরকারী ও একটি ছোট পাত্র রান্না ঘরে দিয়া যান। আমি স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিব। কোন চিন্তা নাই।"

"চির সন্ন্যাসী তুই"

সেদিন অতুলচন্দ্রের স্কুলে যাইবার কেবল যে ইচ্ছা ছিল না তাহা নহে, শক্তিও ছিল না। তথাপি বন্ধুহরির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দৃঢ় নিষ্ঠার কথা জানা থাকায় দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। একটি পর একটি কত জিনিষ রান্নাঘরে রাখিলেন। এখানে ঘটী, ঐখানে জল, ঝুড়িতে তরকারী, কত কথা কতবার বলিলেন। বন্ধুসুন্দর অতুলচন্দ্রের আর্ত্তি, সেবা যত্ন ও রোরুদ্যমান বদন দেখিয়া অন্তরে অত্যধিক প্রীত হইয়াছেন। তথাপি বাহিরে "আমি সব দেখে নেব, আপনি আর দেরী করিবেন না" বলিয়া তাঁহাকে স্কুলে পাঠাইবার ত্বরা দেখাইতে লাগিলেন।

অতুলচন্দ্র দুর্ব্বার নয়ন ধার মুছিতে মুছিতে স্কুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। যাইবার কালে বন্ধুসুন্দরকে প্রণাম করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু লজ্জায় পারিলেন না। মনে মনেই কোটী প্রণাম জানাইলেন। কতদূর অগ্রসর হইয়া অতুলচন্দ্র পিছন ফিরিয়া ঘরের জানালার দিকে তাকাইলেন। অকস্মাৎ জানালা ফাঁক হইল। বন্ধুসুন্দরের বস্ত্রাবৃত শিরোদেশটী দেখা গেল। অতুল বুঝিলেন, জগৎসুন্দরও লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন। তপ্ত অশ্রু অতুলের বুকের উপর গড়াইয়া পড়িল।

স্কুলে সকলে অতুলচন্দ্রের মুখের অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া নানা আলোচনা করিতে লাগিল। অতুল শারীরিক কারণ জানাইয়া দ্বিতীয় শিক্ষকের উপর কার্য্যভার অর্পণ করতঃ লাইব্রেরীতে গিয়া একখানি বই লইয়া বসিলেন। কিন্তু বই

পড়িবে কে? পড়াতো উদ্দেশ্য নয়। উহা অন্যের প্রশ্ন এড়াইবার একটি ছল মাত্র।

অতুলচন্দ্রের সমগ্র হৃদয়খানি জুড়িয়া আজ জগদ্বন্ধুসুন্দর বিরাজমান। তিনি যেন কি একটা অনুভব করিতেছেন। একটা অতি আপন বস্তু যেন কাছে আসিয়া তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে। যেন ধরা দিতেছে না। মাতৃহারা বালকের যেন মৃতমাতা ফিরিয়া আসিয়াছেন। অথচ কাছে থাকিতে দিতেছেন না। অথবা, প্রোষিত ভর্তৃকার স্বামী যেন আসিয়াছেন। অথচ মিলনের সুযোগ ঘটিতেছে না। অতুলের প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। রাঙ্গা চক্ষু প্রবল ধারায় বর্ষণ করিতেছে। লাইব্রেরীতে থাকা আর সম্ভব হইল না।

অতুল স্কুল হইতে বাহির হইয়া গিয়া মাঠের মধ্যে বড় বট বৃক্ষটির তলায় বসিলেন। কিন্তু সেখানে অধিকক্ষণ থাকা গেল না। ঘড়ি দেখিলেন, তিনটা। দ্রুত পদে মেছে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন ঘরে জগৎসুন্দর নাই, কোথায় গেল ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্তের ন্যায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রিত কি জাগরিত এমন সময় দেখিলেন,—

অতি জ্যোতির্ম্ময়রূপে সহাস্যমুখে বন্ধুসুন্দর দাঁড়াইয়া আছেন। কচি কলা পাতা মোড়া কি যেন একটা বস্তু অতুলকে দিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছেন। অতুলচন্দ্র সে অজস্র রূপ-সুধা পান করিতেছেন। বন্ধুসুন্দর বলিতেছেন "অতুল, আয়! তোকে দিয়ে আমার অনেক কাজ। চির সন্ন্যাসী তুই, তুই কেন ঘরে! গোবিন্দের ইচ্ছা হইলে অচিরে—"

অতুল ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া রুদ্ধদ্বার খুলিয়া সদর পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেলেন। কোথাও কিছু নাই। অতুল বুঝিলেন, ইহা স্বপ্ন।

"বাজ রে শিঙ্গা"

অতুলচন্দ্র অধীর আগ্রহে বন্ধুসুন্দরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, বন্ধুসুন্দর আসিলে একটা যুক্তি করিয়া এদিকের এক ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার সহিত পরদিনই গৃহত্যাগ করিবেন। সময় আর কাটিতেছে না। তিনি উঠিলেন। জানালায় দাঁড়াইয়া কতক্ষণ নদীর পথটীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর আসিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাঁহার সাধের চারণ বেশটী বাহির করিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে অতুলচন্দ্র বড় সাধ করিয়া একটী চারণ বেশ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে আছে, একটী গৈরিক আলখেল্লা একটী গৈরিক বস্ত্র ও একটী বিউগেল্‌। স্বদেশভক্ত স্বাধীনতার পাগল অতুলচন্দ্রের বড় বাসনা ছিল তিনি চারণ হইয়া দেশে দেশে বিউগেল বাজাইয়া—

"বাজ রে শিঙা বাজ এই রবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
ভারত শুধুই ঘুমিয়ে রয়।"

হেমচন্দ্রের সেই প্রাণমাতান আহ্বানে দেশকে জাগ্রত করিবেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ঐ বেশে সাজিয়া স্কুলের ছাত্রদের

সাথে বাগানে বাগানে বেড়াইয়া বিউগেল্ বাজাইয়া ঐ গানের মহড়া দিয়াছেন। আজও একবার সেই সাধ জাগিল, ট্রাঙ্ক খুলিয়া সকল বাহির করিলেন। যেইমাত্র জগৎসুন্দরের মুখখানি ও তাঁহার সঙ্গ আহ্বানের কথা মনে পড়িল, অমনি যেন মন প্রাণ কেমন হইয়া গেল। তাঁহারই কার্য্য করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। অমনি সব চাপা দিয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিলেন।

সন্ধ্যা হয় হয়। অতুলচন্দ্র জানালার দিকে দেখিলেন, চারিদিকে সাঁজের আঁধার নামিতেছে। একটী বালক ঘরে একটী আলো দিয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া তিনি একটী ট্রাঙ্কের উপর বসিলেন। চেয়ারে বসিতে ইচ্ছা নাই। সেটীকে আর একজনের জন্য খালি রাখিলেন। রাত্রি হইতেছে। অতুল ভাবিলেন—ছোটমামা কি চলিয়াই গেলেন! ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে কান্না আসিল। অতুলচন্দ্র ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"কিঞ্চিৎ পত্র-প্রসাদ আছে"

"পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত॥"

—শ্রীকৃষ্ণ দাস

দ্বারে দুইটি ছোট টোকার শব্দ শোনা গেল। অতুলচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া দুয়ার খুলিলেন। নীরব বস্ত্রাবৃত একটি মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। অন্ধকারে ও তাঁহার বস্ত্র ছাপাইয়া একটী নীলাভ

জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে। অতুল প্রায় অভিভূত। কপট চূড়ামণি গৃহাভ্যন্তরে আসিয়াই বলিলেন, "আমি রাত্রির গাড়ীতেই পশ্চিম রওনা হইব, শুধু আপনার জন্যই একবার আসিলাম। কিঞ্চিৎ পত্র-প্রসাদ আছে, গ্রহণ করিবেন।" এই মাত্র বলিয়াই, বন্ধুসুন্দর বাহিরে যাইবার উপক্রম করিলেন। অতুল অমনিই "ছোট-মামা! তুমি-যাবে-না" বলিয়া বাঁতাহতের মত চরণে পড়িলেন। সারাদিনের প্রস্তুত বারুদ যেন অগ্নিসংযোগে ফাটিয়া গেল।

পরম স্নেহের পরশে অতুলচন্দ্রকে ভূমি হইতে তুলিয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন "স্থির হন। বিচলিত হবেন না। গোবিন্দের ইচ্ছা হইলে অচিরে কলিকাতায় মিলন হবে।" বলিতে বলিতে বন্ধুসুন্দর ত্রস্ত পদে বাহির হইলেন। অতুল অনুগমন করিতে চেষ্টা করিলে ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। ফিরিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া মেঝেতে পড়িয়া অতুল বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। যেইমাত্র মনে হইল, বন্ধুর নির্দ্দেশ "স্থির হন, বিচলিত হবেন না" অতুল অমনি কৃপাশক্তিতেই স্থির হইয়া বসিলেন।

তৎপর তিনি গৃহমধ্যে পত্র-প্রসাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। উহা পাইয়াই আবার অশ্রুপ্রবাহ দেখা দিল। কারণ, কলাপাতার মোড়কটী স্বপ্ন দৃষ্ট প্রভুর হস্তস্থিত সেই মোড়কটীই! একি খেলা! তাহাকে কাঁদাইবার জন্যই কি লীলাময় বন্ধুসুন্দরের এই সব আয়োজন!

মোড়কটী খুলিয়া অতুলচন্দ্র কয়েকটী ঘৃতসিক্ত অন্ন পাইলেন। তৎক্ষণাৎ উহা মস্তকে রাখিয়া পরম আদরে গ্রহণ

করিলেন। প্রাণের আবেগে পাতার টুক্‌রাটী চিবাইয়া খাইয়া ফেলিলেন। গ্রহণমাত্র অতুলচন্দ্রের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ভাব প্রস্ফুটিত হইল। তাঁহার মুখ হইতে, ঘন ঘন হরিবোল হরিবোল ধ্বনি স্বতঃই স্ফুরিত হইতে লাগিল। বিষয়ের নশ্বরতা ও কৃষ্ণভজনের পারমার্থিকতা গভীরাতিগভীর ভাবে হৃদয়ে অনুভূত হইতে লাগিল। সর্ব্বাকর্ষণী বংশীর ধ্বনি যেন স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আর বিলম্ব নয়। মুহূর্ত্তের বিলম্বও অসহনীয়। আজ রাত্রেই গৃহ ত্যাগ।

বৈরাগ্য-ভাগ্য

"চিন্তা কান্থা উড়ে গায় ধূলি-বিভূতি-মলিন কায়,
হাহা! কৃষ্ণ প্রলাপ-উত্তর।
উদ্বেগ-দ্বাদশ হাথে লোভের ঝুলনী মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর॥"

—শ্রীকৃষ্ণ দাস

অতুলচন্দ্র গৈরিক বস্ত্র ও আলখেল্লা পরিয়া নিজের কল্পনা-মত চারণ বেশে সাজিলেন। বিউগেলটি লইলেন। ঘরের আলোক নিভাইয়া অন্ধকারে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। গভীরনাদে হরিবোল ধ্বনি উচ্চারিত হইল। প্রতিবেশিগণ চমকিত হইয়া সে ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইল। কিছুক্ষণ নীরব। আবার বহু দূর হইতে হরিবোল ধ্বনি। সে ধ্বনিতে দিগদিগন্ত যেন কম্পমান হয়। অন্ধকারের মধ্যে অতুলচন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছেন। ষ্টেশনের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। আশা,

যদি আবার সে প্রাণারাম মূর্ত্তিটির সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। অতুল ছুটিতেছেন,—ভগ্ন হৃদয়, নগ্ন চরণ, কণ্ঠলগ্ন বিউগেলটি সবুজ একটী দড়ীর সাহায্যে বামপার্শ্বে দোদুল্যমান। ঘন ঘন হরি-হরি-বোল ধ্বনি। মধ্যে মধ্যে বিউগেল ধ্বনি করিয়া "বাজরে শিঙা" ও বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু হরিধ্বনির ন্যায় তাহা গম্ভীরও নহে, প্রাণবন্তও নহে। অতুলের চক্ষে শ্রাবণ ধারা। হৃদয়ে বন্ধন-মুক্তির আনন্দ।

একখানি পশ্চিমগামী ট্রেণ ষ্টেশনে থামিল। অ-ধরকে ধরিবার আশে অতুলচন্দ্র দ্রুততর ছুটিলেন। কিন্তু তিনি ষ্টেশনে পৌঁছিবার বহুপূর্ব্বে গাড়ীখানি বিকট শব্দ করিয়া ছাড়িয়া দিল। অতুল বসিয়া প'ড়িলেন। ছোটমামাকে কোটী প্রণাম জানাইয়া প্রাণ গোবিন্দের চরণে অচিরে কলিকাতায় মিলনের জন্য নিবেদন জানাইলেন। তারপর ধীরে উঠিয়া ষ্টেশনে চলিলেন। অন্ধকার আকাশ ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে গভীর নাদে হরিধ্বনি উঠিতে লাগিল।

অতুলচন্দ্র ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলেন একখানি কলিকাতা-গামী ট্রেণ কি কারণে পূর্ব্ব হইতে আটকাইয়া আছে। ইহা প্রভুরই কৃপা বুঝিয়া তিনি টিকেট কাটিয়া ট্রেণে বসিলেন। গাড়ী ছাড়িল। অতুলচন্দ্রও বিষয় ভোগ বাসনা চিরতরে ছাড়িলেন। কলিকাতা অতুলের বাড়ী কিন্তু অতুল আজ বাড়ী যাইতেছেন না। তিনি চলিয়াছেন চির অজানার সন্ধানে এক দুর্জ্ঞেয় পথে। যে অজানা অচেনা শাশ্বত সত্যকে অতুল ছোটমামার মধ্যে মূর্ত্তিমন্ত দেখিয়াছেন, তাহাই ধরিতে বুঝিতে

আস্বাদন করিতে, অতুল চলিয়াছেন ভূমার অভিমুখে। বিউগেল বাজিল গম্ভীর ধ্বনিতে। প্রতিধ্বনি ঘোষণা করিল—

"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।"

"ত্যাগই সুখ, বৈরাগ্যই ভাগ্য।"

ধাবমান শ্রীকৃষ্ণ

সখি হে! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন।
ক্ষণেকে যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥

—শ্রীকৃষ্ণ দাস

ট্রেণে উঠিয়াই ক্লান্ত অতুলচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িলেন। শেষ-রাত্রে নিদ্রা টুটিয়া গেল হু হু করিয়া ট্রেণ চলিতেছে। অতুলচন্দ্রের বুকটার মধ্যেও হু হু করিতেছে। বিল্বমঙ্গলের প্রলাপ এক শ্লোক পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল,—

অমূণ্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেন।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

"অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোমা বিলোকন, এই কাল কাটা নাহি যায়।" অতুলচন্দ্রের দুই চক্ষু ছাপাইয়া জল ঝরিতেছে। বেঞ্চিতে বসিয়া তিনি কৃষ্ণপক্ষের ম্লান জোৎস্নায় মাঠ বন ও দূরের গ্রামগুলির দিকে তাকাইতেছেন। মাঝে মাঝে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে।

অতুলচন্দ্র হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। কি আশ্চর্য্য! লাইনের নীচে মাঠের রাস্তায় একটি বালক ছুটিতেছে। বালকটী দেখিতে যেন একটি অবিকল ছবির শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার চারিদিকে একটা অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা। জঠর পটে বাঁশীটি, কণ্ঠে মালাখানি, তাহাও দৃষ্ট হয়। তাঁহার গতি এত দ্রুত যে, চলন্ত গাড়ীতে বসিয়া তাঁহাকে বরাবর জানালার সম্মুখেই দেখা যাইতেছে। এ কি! প্রাণের দেবতা কি সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিতেছেন! অতুল ভাল করিয়া চক্ষু মুছিয়া তাকাইলেন। কৈ কিছুই নাই। তবে কি ইহা ভুল! তিনি উঠিয়া অন্যদিকের জানালায় আসিলেন। ঐ যে এবার এদিকেও পথ ধরিয়া ধাবমান সেই বালকটিই। কিছুক্ষণ দেখিয়া, অতুল আর দেখিলেন না। আবার ওদিককার জানালায় দৃষ্টি করিলেন। ঐ যে আবার এদিকে আসিলেন, ঠিক তেমনই। একবার এই জানালায় একবার ঐ জানালায় অতুল দুই দিকে ছুটাছুটি করিয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন—প্রাণ-প্রেষ্ঠ চলন্ত ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতেছেন!

ট্রেণের প্রকোষ্ঠে আরও কতিপয় আরোহী। সবাই নিদ্রাতুর। চির জাগ্রতের দর্শনে একমাত্র অতুলচন্দ্রই ভরপুর। অনেকবার এ-জানালা ও-জানালা করিয়া ত্রস্ত হইয়া একটি জানালায় বসিয়া নির্নিমিষে আবার দেখিতে লাগিলেন। আবার অবিরল অশ্রুধারা বহিল। তারপর ভোরের হাওয়ায় কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, জানেন না। প্রভাতে গাড়ী ব্যাণ্ডেলে থামিল। অতুল চক্ষু খুলিয়া জানালায় তাকাইলেন। লোকজন, যাত্রী-কোলাহল। সেই ধাবমান প্রাণকৃষ্ণ আর

নাই! "ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমা ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ!" অতুলচন্দ্র হা হুতাস করিতে লাগিলেন। রাত্রের ঘটনা স্মরণে আসে। ছোটমামার কথা মনে পড়ে। বুকের মধ্যে দুর দুর করে!— "অচিরে কলিকাতায় মিলন হবে" এই আশায় অতুল বুক বাঁধে। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সে ইষ্টধ্যানে ডুবিয়া রয়।

গাড়ী হাওড়া পৌছিল। ধ্যানস্থ অতুল গভীর নাদে "হরিবোল" বলিয়া উঠিলেন। একবার মনে হইল, তিনি হাওড়া প্লাটফরমে তাঁহার বাঁশী বাজাইয়া অসংখ্য যাত্রীগণের মধ্যে জাগরণের সাড়া ফেলিয়া দেন, কিন্তু ইহা তাঁহার বহুদিনের সাধ হইলেও, চারণ বেশধারী সন্ন্যাসী হইয়া এখন যেন আর সে প্রবৃত্তি হইল না।

পুল পার হইয়া বামদিকে কিছুদূর যাইয়া একটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ঘাটে তিনি স্নানাদি সমাপন করিলেন। মুখ হইতে সুগম্ভীর হরিধ্বনি ঘন ঘন বাহির হইতে লাগিল। বস্ত্রখানি শুকাইলে, আলখেল্লার উপর তাহা জড়াইয়া বিউগেলটি চাপা দিয়া অতুলচন্দ্র যদৃচ্ছা চলিতে সুরু করিলেন।

আহার নাই, নিদ্রা নাই। ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধও নাই। আপনমনে বসেন, দাঁড়ান, হাঁটেন। মুখের গদগদ ভাব দেখিয়া কোন ভক্তজন হয়ত বাড়ীতে ডাকিয়া কিছু খাইতে দেন। আবার চলেন, বসেন। প্রভাতে গঙ্গাস্নান, যত্র যত্র ভ্রমণ, ঘন হরিধ্বনি, আর মাঝে মাঝে বিপুল কান্না। যথালব্ধ আহার, পার্কে শয়ন, আর কতদিনে "অচিরে" হয়, কবে "গোবিন্দের ইচ্ছা" হইবে, এই বিরাট কলিকাতায় বিনা ঠিকানায় কবে ছোট

মামার সহিত মিলন হইবে—আকুল আগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা।

যাহারা মদনমিত্রের লেনের চম্পটী ঠাকুরের বাড়ীঘর চিনে, তাহারা একবাক্যে কহিল, অতুল পাগল হইয়াছে। অতুলের বস্ত্র মলিন, দেহ মলিন, কেবল প্রাণটা অমলিন। আহার নিদ্রার সময় নাই। কিন্তু হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্নার বিরাম নাই। যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা বোঝে, এ পাগল নহে দয়িতের সন্ধানে অভিসারিকা ব্রজবালা।

"হরে কৃষ্ণ, এদিকে"

"ছেড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
গলে ছিন্ন কন্থা করি, দন্তে তৃণ গুচ্ছ ধরি,
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে॥"

—শ্রীরাধাবল্লভ দাস

আজ অরুণোদয় হইতে অতুলচন্দ্রের প্রাণে অজানা কারণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইতেছে। গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, মনে হইতেছে যেন মধুধারা। আকাশ বাতাস নরনারী পশু পক্ষী পার্থিব রজঃকণা পর্য্যন্ত মধুময়। চারিদিকে যা কিছু দেখেন শোনেন সবই পরম মঙ্গলদ্যোতক। অতুলচন্দ্র বুঝিলেন —জগৎসুন্দর নিশ্চয়ই কলিকাতা পদার্পণ করিয়াছেন। অতুলের উৎকণ্ঠা সীমান্তে পৌঁছিয়াছে। বিপুল ব্যগ্রতা লইয়া তিনি কেবল চারিদিক দেখিতেছেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে স্নান করিয়া অতুল ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। বস্ত্র শতছিন্ন। সর্ব্বাঙ্গ ধূলিমলিন। মাথার চুল আলুলায়িত। হস্তে পদে দীর্ঘ নখ, মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রু, গায়ে গৈরিক আলখেল্লা। স্কন্ধে বিউগেল। কণ্ঠে ঘন ঘন হরিধ্বনি। সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি "সুনীল অম্বর ভেদি' ধায়।" নয়নের শ্রাবণধারা মুখ ভাসাইয়া বুকে প্রবহমানা হয়। ধন্য ভক্ত! ধন্য ভক্তের হরিধ্বনি!

একখানি সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ী ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। যেন একটী জ্যোতির ঝলক। অতুলচন্দ্র চাহিয়া রহিলেন। গাড়ীর দরজা জানালা সব বন্ধ। একটা জানালা একটু ফাঁক করিয়া বস্ত্রাবৃত শ্রীমুখখানি ঈষৎ প্রকাশ করিয়া রঙ্গলাল বন্ধু-বিনোদিয়া মৃদু হাততালি দিতেছেন। আওয়াজটী কি মধুর, চিরকালের আপন-করা। অতুলচন্দ্র নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নয়ন বিস্ফারিত, হৃদয় আশান্বিত।

একটি মধুরাতিমধুর কণ্ঠধ্বনি কানে এল।

"হরেকৃষ্ণ, এদিকে।"

অতুল মনে মনে বলিলেন, অহো, আমার সর্ব্বস্ব ধন ঐ দিকে। অতুলচন্দ্র অগ্রসর হইলেন। জানালার ঐ ফাঁকাটুকু দিয়া চোখে চোখে পড়িল। আনন্দের মহাসমুদ্র নামিয়া আসিল। পূর্ব্বরাগের বিরহের পর যেন প্রেমিক প্রেমাস্পদের নয়নে নয়নে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ হইয়া গেল।

প্রভুবন্ধু অতুলচন্দ্রকে গাড়ীর ভিতরে ডাকিলেন। ভয়ে

সংকোচে নিজেকে অপবিত্র জ্ঞানে অতুলচন্দ্র কিছুতেই ভিতরে যাইতে রাজী হইলেন না। অগত্যা অতুল গাড়ীর উপরে উঠিয়া বসিলেন। প্রাণ খুলিয়া দু'বাহু মেলিয়া হৃদয় উঘারিয়া হরি-হরি-বোল ধ্বনি উত্থিত হইল। সে কী ধ্বনি, দিগ দিগন্ত আনন্দে প্রকম্পিত হইল। গাড়ীর মধ্যে বন্ধুসুন্দরও আনন্দে ডগমগ হইলেন। অতুল! তোমার ধ্বনি সার্থক। দেখ, যাঁ'র নাম তিনিও বিমুগ্ধ!

নামী নাম ও প্রেম

গাড়ীখানি ৬৭নং চাষাধোপাপাড়া লেনে গিয়া থামিল। প্রভু-বন্ধু নিজ থাকিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের বারন্দায় অতুল বসিলেন। অতুলের আর কোন অশান্তি নাই। প্রচুর বর্ষণে দাবানল চির নির্ব্বাপিত। সর্ব্বসাধনার ধন যেন তাঁহার সম্মুখে। "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

বন্ধুসুন্দর কখনও উঠিতেছেন, কখনও বসিতেছেন, কখনও লিখিতেছেন, কখনও বা স্থিরভাবে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া আছেন। অতুলচন্দ্র পার্শ্বে বসিয়া রূপসুধা পান করিতেছেন। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একটি একটি করিয়া বহুভক্ত আসিলেন। বন্ধুহরি তাহাদের প্রতি মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনামের উপদেশ দিলেন। মধুর স্বরে নাম করিতে করিতে একটি কৃষ্ণবর্ণ বালকভক্ত আসিল। হাতের করতালির তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই স্বল্প পরিসর উঠানে দাঁড়াইয়া

বন্ধুসুন্দরকে নাম শুনাইতে লাগিল। অতুল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বালকটির কণ্ঠস্বর প্রাণমাতান, উদাস-করা। সে গাহিতেছে—

কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম,
রাধা মাধব রাধিকা নাম।

প্রেমে ঢলঢল অবস্থায় বন্ধুসুন্দর নাম শুনিতেছেন। অতুলচন্দ্রও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সাশ্রু নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, সেই রাত্রের সেই মধুর কৃষ্ণবর্ণ বালকটিই যেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে। অতুল আনন্দের উন্মাদনায় হাততালি দিতে আরম্ভ করিলেন। আশ্চর্য্য নিষ্ঠা ও প্রেমে বালকটি মধুর স্বরে প্রায় দেড়ঘণ্টা নাম গাহিল। কোনরূপ শ্রান্তি ক্লান্তি বা বিরক্তির আভাস পর্য্যন্ত নাই। বরং উত্তরোত্তর যেন উল্লাসের আধিক্যই দৃষ্ট হইতেছে। বালকটির সঙ্গে অতুলচন্দ্র নাচিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবে রসে প্রেমে গদগদ কীর্ত্তনটি যে কিরূপ বস্তু, অতুলের জীবনে আজ তাহা তিনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন। অতুল, নামী নাম ও প্রেম তিন বস্তুকে একই সময় দেখিলেন। দুই ঘণ্টাকাল এইভাবে চলিল। তারপর বালকটি নাম বন্ধ করিল। শ্রীশ্রীপ্রভু তাহাকে একখানি নামাবলী দিলেন। সে তাহা মাথায় জড়াইয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে বা অতঃপর কেহ কখনও এই বালককে ঐ অঞ্চলে বা কোথাও দেখিতে পায় নাই। বুঝি বা, অতুলচন্দ্রের নবজীবন প্রভাতের বৈতালিক রূপেই তাহার উদয় হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীপ্রভুর আহারের পর অতুলচন্দ্রের ডাক পড়িল।

বাটীর মধ্যে অন্য দুই একটী ভক্তের সহিত প্রসাদ পাইলেন। কাহারও সহিত বিশেষ কথাবার্ত্তা কহিলেন না। কাহারও সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি যেন আর অন্তরে নাই। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার ঘাড় গুঁজিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রসাদ গ্রহণের ভাব দেখিয়া, কেহ তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

অপরাহ্নে কতিপয় কলেজের ছাত্র আসিয়া হরিবোল ধ্বনি করিল। প্রভুবন্ধু আসিয়া অতি নিজজনের মত তাহাদের সম্মুখে বসিলেন ও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অতি মধুর স্বরে কিছু উপদেশামৃত বর্ষণ করিলেন। অতুলচন্দ্র বসিয়া বসিয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু বাড়ীর একজনকে দুইটী টাকা দিয়া বলিলেন,—

"ওরে সারাদিন কলেজ ক'রে কচি কচি ছেলে সব মুখ শুকিয়ে বসে আছে, ওদের একটু জল খেতে দে।" অতুলচন্দ্র প্রভুর বাৎসল্য-মধুর ব্যবহার দেখিয়া গলিয়া গেলেন। প্রধান শিক্ষক রূপে কত ছেলেকে এমন দিনান্তে শুষ্ক মুখে বাটী যাইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু এমন করিয়া নিজের ভিতরে কখনও অনুভূতি আসে নাই। আর চির ফকির প্রভু পরের ছেলেকে কেমন নিজের মত করিয়া স্নেহ আদর ঢালিয়া ভালবাসিতেছেন! পরের ছেলের মুখ দেখিয়া তিনি যে ব্যথা অনুভব করিলেন তাহাতে এতটুকুও কৃত্রিমতা প্রকাশ পাইল না।

দোকান হইতে মিষ্টি আসিল। প্রভুবন্ধু বালকদিগকে বলিলেন "তোরা হাততালি দিয়ে হরিবোল হরিবোল বল,"

বালকগণ কিছু সময় ঐরূপ করিলে প্রভুবন্ধু অতি মধুর হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে খাবার দিলেন। তাহারা খাবার খাইয়া প্রণত হইয়া বিদায় লইল।

দীনবেশ ও তপস্যা

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥

—শ্রীকৃষ্ণ দাস

বালক ভক্তগণ চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীপ্রভু অতুলচন্দ্রের দিকে কয়েকবার তাকাইলেন। এতক্ষণ যেন তাঁহাকে দেখেন নাই। কয়েকবার তাকাইয়া বলিলেন "আপনি গৈরিক পরিয়াছেন কেন? গৈরিকে তো আপনার অধিকার হয় নাই।" উত্তরে অতুলচন্দ্র বলিলেন "অমনি পরেছি। অধিকারের কথা ভাবিনি।" বন্ধুহরি বলিলেন "আপনি গৈরিক ত্যাগ করবেন?" অতুল উত্তর করিলেন "তুমি বল্লেই করব।" বন্ধুসুন্দর তখন অতুলের সামনে দুইটি টাকা রাখিয়া বলিলেন "একখানি কাপড়, উত্তরীয় এবং এক জোড়া করতাল কিনিয়া আনুন।" অতুল তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গিয়া করতাল ও কাপড় কিনিয়া আনিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

লীলাময় বন্ধুসুন্দর তখন অতুলচন্দ্রকে অতি নিকটে ডাকিয়া ধীরে অথচ সুস্পষ্ট ভাবে কহিতে লাগিলেন, "কাল প্রত্যুষে জগন্নাথ ঘাটে গিয়া একটি ডুব দিয়া গৈরিক ফেলিয়া এই নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় গ্রহণ করিবেন। করতাল সংযোগে 'কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম' নাম গাহিয়া টহল দিবেন। জগন্নাথ ঘাট হইতে বরাবর কালীঘাট যাইবেন। কালীঘাটের গঙ্গায় একটি ডুব দিয়া পুনরায় জগন্নাথ ঘাটে আসিয়া একটি ডুব দিবেন। এইভাবে একবার কালীঘাট একবার জগন্নাথঘাট দিনরাত্রে যতবার পারেন করিবেন। সর্ব্বদা নাম চলিবে। খাওয়া দাওয়া গোবিন্দের ইচ্ছার উপর নির্ভর রহিবে। এর পর আমি আপনাকে মহাপুরুষ দর্শন করাইব।" একটু পরে আবার বলিলেন "এত-দিন তো মহাপুরুষ দেখিবার চক্ষু হয় নি।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর এই সব আদেশ বাক্যে অতুলচন্দ্রের হৃদয়ে পরমানন্দের উদয় হইল। ঐ আদেশ পালন করা তেমন একটা কঠিন কাজ বলিয়া মনে হইল না। যেন ঐরূপ করিতেই তিনি বাড়ী-ঘর আড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ সব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। উল্লাসে অতুল প্রভুবন্ধুর চরণ সমীপে প্রণত হইলেন।

প্রভু গম্ভীরভাবে থাকিলেন, কিছু বলিলেন না। যেন প্রণাম গ্রহণ করিলেন।

ইহার পরেই বন্ধুসুন্দর বাহির হইলেন। অতুলচন্দ্র ছায়ার মত সঙ্গে চলিলেন। এদিক ওদিক কয়েকটি রাস্তা ঘুরিয়া প্রভু বিডন ষ্ট্রীটে আসিলেন। সেই সময় বিডন ষ্ট্রীটের উপর গ্রাণ্ড

আশনাল থিয়েটার ছিল, বর্ত্তমানে ঐ গৃহে পোষ্ট অফিস হইয়াছে। প্রভুবন্ধু যখন থিয়েটার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন রঙ্গমঞ্চে বিল্বমঙ্গল নাটক অভিনীত হইতেছিল। বন্ধু-কৃপায় হঠাৎ থিয়েটার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্মুখ ভাগের একটি আসনে গিয়া বসিলেন। অতুলচন্দ্র পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। কেহ কিছু বলিল না।

অভিনয় তখন চলিতেছে। ষ্টেজের উপরে উজ্জ্বল আলো। শ্রোতৃবৃন্দের বসিবার স্থান কতকটা অন্ধকার অন্ধকার। বিল্বমঙ্গল নদী সাঁতরাইয়া বারবণিতা চিন্তামণির কাছে পৌঁছিয়াছে। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিয়াছে। তাহার উপদেশপূর্ণ তীব্র ভৎর্সনায় বিল্বমঙ্গলের বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

এই নর দেহ জলে ভে'সে যায়,
ছিড়ে খায় কুক্কর ও শৃগাল,
কিংবা চিতাভস্ম পবন উড়ায়।
এই নারীদেহ এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে তবে, হায়! প্রাণ দি'ছি কা'রে
কই কোথা কে আছে আপন জন॥

এই সব কথা বলিয়া নিতান্ত আর্ত্তের মত বিল্বমঙ্গল যখন গদ গদ কণ্ঠে, কাতরে কাঁদিতেছেন, ইচ্ছাময় শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর তখন কি জানি কেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বস্ত্রাবৃত শ্রীদেহ হইতে এত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল, যে ষ্টেজের আলো

তাহাতে নিষ্প্রভ প্রতিভাত হইতে লাগিল। দাঁড়াইবামাত্র বন্ধুসুন্দর দর্শকগণের দিকে একটু ফিরিলেন ও ক্ষণমাত্র তাকাইলেন। সমস্ত দর্শকবৃন্দ তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। পরমুহূর্ত্তেই বন্ধুহরি বাহিরে আসিলেন। কি আশ্চর্য্য! দর্শকবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হুড় হুড় করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া আসিল।

অতুলচন্দ্রও প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছেন। দর্শকগণ বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক ফিরিতেছে। বন্ধুসুন্দর ইতি মধ্যেই আপন জ্যোতিঃরাশি সংবরণ করিয়াছেন। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদু মন্দ হাসিতেছেন। অতুলচন্দ্র পার্শ্বেই। কিন্তু ঐ দুই মূর্ত্তিকে কেহই যেন দেখিতেছে না। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করিয়াও আর ছত্রভঙ্গ দর্শকবৃন্দকে ভিতরে আনিতে পারিলেন না। কেবল দর্শকবৃন্দ নহে, অভিনেতৃগণের মধ্যেও যাহারা বন্ধুসুন্দরকে দর্শন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই অনেক-ক্ষণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিল। বন্ধুহরি স্মিতমুখে অতুলচন্দ্রকে এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া ধীরে ধীরে পার্শ্বের গলি দিয়া বলরাম দে ষ্ট্রীটে পড়িলেন। সেখান হইতে পশ্চিম মুখে আসিয়া চাষাধোপাপাড়ায় হরকুমার রায়ের বাড়ীতে নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

গৃহমধ্যে প্রভু এবং বাহিরের বারান্দায় অতুল রহিলেন। রাত্রে অতুলের বেশী ঘুম হইল না। থিয়েটারে যে দৃশ্য দেখিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ তাহার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

বিল্বমঙ্গলের উক্তিগুলি, একবার শ্রবণেই অতুলচন্দ্রের কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি

করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের নবজাগ্রত বৈরাগ্য দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

অতি প্রত্যুষে অতুল উঠিয়াছেন। গৃহমধ্য হইতে বন্ধুহরি "হরেকৃষ্ণ" বলিয়া তাঁহাকে যাত্রার ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ অতুলচন্দ্রও 'হরি-হরিবোল' বলিয়া রওনা হইলেন। জগন্নাথ ঘাটে স্নান করিয়া নববেশ ধারণ পূর্ব্বক করতাল সংযোগে নাম ধরিয়া কালীঘাট চলিলেন। ষ্ট্রাণ্ড রোড হইতে ধর্ম্মতলা ও তথা হইতে চৌরঙ্গী এবং সেখান হইতে বরাবর কালীঘাটের গঙ্গায় গিয়া স্নান। সামান্য বিশ্রামের পরেই জগন্নাথ ঘাটে আসা ও আবার স্নান।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন। একই টহল। রাস্তা ইচ্ছামত কিছু কিছু বদল করেন। তাঁহার নয়ন অধিকাংশ সময়ই অশ্রুপূর্ণ। আর্দ্র বস্ত্র অঙ্গেই শুকায়। যথা সময়ে গোবিন্দের ইচ্ছায় কেহ না কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া খাওয়ায়। তিনি প্রভুর কৃপাশক্তিতে শক্তিমান। কঠোর তপস্যায় অটুট বিশ্বাসে ও শ্রীনামের মহাশক্তিতে তাঁহার দেহের অস্তিত্ব বোধ, দেহেন্দ্রিয়ের দুঃখ কষ্ট সুখভোগ সকলই কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। অতুলচন্দ্র দেহগেহ, দারা সুত, আত্মীয় পরিজন, বিদ্যার অভিমান, বংশের অভিমান, পদমর্য্যাদার অভিমান সকলই ভুলিয়াছেন।

অতুলচন্দ্রের অটল অচল ব্রত অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিতে লাগিল। কতজন তাঁহার পথের বাধক হইয়াছে, কিন্তু অতুলের ব্রত ভঙ্গ হয় নাই। মাউণ্টেড পুলিশ, ভীমাকৃতি সোলজার, সঙ্গীনধারী

সার্জ্জেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া ধূর্ত্ত লম্পট পাষণ্ডী জন কত ভাবে যে তাঁহার গতিরোধ ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সকলের সে-সকল চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাই আশ্চর্য্য কথা। শ্রীঅতুলের মুখের নিরূপম জ্যোতিঃ, দৃষ্টির তীব্র প্রখরতা, মনের দুর্দ্দমনীয় দৃঢ়তা, প্রাণের আত্মিক বল, সর্ব্বোপরি বন্ধুসুন্দরের অমোঘ কৃপা শক্তির সম্মুখে সকলেই অভিভূত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। ধন্য ভক্ত, ধন্য কৃপা শক্তি!

অতুলের ব্রতপূর্ণ

তাঃ বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তত মোহিতাঃ॥

—শ্রীশুক

ভাগীরথীকে একবার বামে রাখিয়া একবার দক্ষিণে রাখিয়া কালীঘাট হইতে জগন্নাথ ঘাট, জগন্নাথ ঘাট হইতে কালীঘাট দিনের পর রাত্র রাত্রের পর দিন আজ সুদীর্ঘ দ্বাদশ মাস একটি আত্মভোলা যুবক—উচ্চ বংশীয়, উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষক হরিবোল হরিবোল বলিয়া, কখনও ধূলায় গড়াইয়া কখনও বাহু তুলিয়া নাচিয়া চলিতেছেন। যে দেখিতে জানে তাহার কাছে এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। যে ভাবিতে জানে, তাহার কাছে জগদতীত মহাসত্যের সন্ধানে এ' এক কঠোরতম তপস্যা।

সাধারণের কাছে ইহা এক অর্থহীন ব্যর্থ কর্ম্ম। পাশ্চাত্য ভাবাপন্নের নিকট ইহা এক উন্মাদের উন্মাদনা মাত্র।

কত আত্মীয় স্বজন, কত প্রিয় পরিজন তাঁহার সাধন পথের বাধক হইয়াছেন। কত সহপাঠী সহকর্ম্মী, সহৃদয় সুহৃদজন তাঁহার কর্ণে সংসারের দায়িত্ব কর্ত্তব্যের কথা প্রবেশ করাইয়া সে গভীর ভাবাবেশ ভঙ্গ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কত ঝঞ্ঝাবাত বজ্রপাত, জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তপন, মাঘের প্রবল শৈত্য, তাঁহার গতিপথে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। এসব বর্ণনাতীত কথা, একমাত্র চিন্তা বা ধ্যানে দর্শন যোগ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কি প্রাকৃতিক, কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি ব্যবহারিক, সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধতাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে বিরাট সাধনার কাঞ্চনজঙ্ঘায় নিষ্ফল আঘাত করিয়া করিয়া সবাই ফিরিয়া গিয়াছে।

নামের শক্তি, কৃপার শক্তি, ঐকান্তিকী নিষ্ঠা তপশ্চর্য্যার শক্তি, সবাই মিলিয়া অতুলচন্দ্রকে পরম প্রেমের পথে তুলিয়া দিয়াছে। প্রেমের ফলে আসিয়াছে আত্মবিস্মৃতি, বিস্মৃতির দ্বারে আসিয়াছে ব্রজের বৈরাগ্য—প্রিয়-সুখৈকতাৎপর্য্যময় গোপীভাব। অতুলচন্দ্র এখন ব্রজের বস্তু। প্রাকৃত জগতের দেশকালের দূরত্ব, প্রিয় পরিজনের মমত্ব, বংশ-বিদ্যা-পদমর্য্যাদার গুরুত্ব সবই তাঁহার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। এক অপূর্ব্ব ভাবের অধিকারী হইয়া তিনি আজ কলিকাতার রাজপথ ধন্য করিতেছেন। তাঁহার চরণপূত পথ কেবল কলিকাতার ইটপাটকেলের রাজপথ নহে, উহা আজ গোপীকৃষ্ণের

চরণ চিহ্নিতা 'রসিতা রজঃরাণী"-মণ্ডিতা ব্রজের পথই। কি যেন অস্ফুট কল-মধুর আহ্বান অতুলচন্দ্রের শ্রবণে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। তাহারই পশ্চাতে সে যেন আজ সুদীর্ঘ একটি বৎসর ধরিয়া "করভ বিক্রমে" ধাবমান। ধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতেছে। অন্তরে অন্তরতম দেবতা বন্ধুহরির সুস্পষ্ট আহ্বান অনুভব করিয়া, অতুল আজ নিত্যকার টহলের পথ ছাড়িয়া রামবাগান অভিমুখে ছুটিয়াছেন।

রামবাগানে পদার্পণ

প্রভু আইলা বলি লোক করে কোলাহল।
মনুষ্য ভরিল সব জল আর স্থল।।

—শ্রীকৃষ্ণ দাস

আজ রামবাগান ডোম পল্লীতে বিরাট উৎসব। দারিদ্র্য-পীড়িত ডোমদের জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুদ্র বস্তীগুলিতে আজ গোলোকের সুষমা—শান্তিপুরের শান্তি। বুঝিবা, গৌড় গগনে গোরাশশীর উদয়। কাঙ্গালের ঠাকুর প্রভু বন্ধুসুন্দর আজ রামবাগানে পদার্পণ করিতেছেন। চাষাধোপাপাড়ার হরকুমার রায়ের বাড়ী হইতে তিনকড়ি মাঝির বাড়ী আসিতেছেন। বাহ্যতঃ, এই দুই বাড়ীর দূরত্ব অতি সামান্য, কয়েক মিনিটে আসা যায়। কিন্তু সামাজিক ব্যবধানের কথা ভাবিলে তাহা দুর্লঙ্ঘ্য। জুয়েলার হরকুমার অর্থশালী ব্যক্তি। তাঁহার গৃহে রাজসেবা। আর

দীনহীন ডোমগণ সমাজের পতিত দারিদ্র্য-পীড়িত সর্ব্বহারা কাঙ্গাল। কোথায় প্রভুকে বসিতে দিবেন, সে স্থানটুকুও তাহাদের নাই। তবু, প্রভু আসিতেছেন। আমরা স্থান না দেখিলেও, তিনি স্থান দেখিতে পাইয়াছেন। তাইতো আসিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন কাঙ্গাল তিনকড়ির হৃদয়খানি শারদাকাশ হইতেও প্রশান্ত। ডোমপাড়ার সরল নর নারীর আর্ত্তি ও আগ্রহ ব্রজরসের ন্যায় নির্ম্মল ও স্বাদু।

আকাশে যেমন তারকারাজি শোভা পায়, সন্ধ্যায় ডোম পল্লীর ক্ষুদ্র কুটিরগুলি আজ তেমনি আলোক মালায় উজ্জ্বল হইয়াছে। ধূপ ধূনা চন্দনের গন্ধে আকাশ বাতাস সুবাসিত হইয়াছে। পল্লীস্থ প্রাঙ্গন ও দ্বারগুলি পুষ্পমালা পতাকায় হাস্যময় হইয়াছে। বালক বালিকার আনন্দ কোলাহলে প্রাণবন্ত হইয়াছে। জননীগণের উলুধ্বনি প্রতিধ্বনিতে কল-মুখর হইয়াছে। খোল করতালের তুমুল রোলে, উচ্চ কীর্ত্তনে, তাণ্ডব নর্ত্তনে, লোক সংঘট্টে ডোমপল্লী আজ রাঘব ভবনের গৌরবকে স্পর্দ্ধা করিতেছে। কাঙ্গালের দেবতা কাঙ্গালদের মধ্যে আসিতেছেন। বলিহারী ভক্ত বাৎসল্য!

প্রতাপ ভৌমিক মহাশয় সব সমাধান করিতেছেন। হরিদাস মোহন্ত মূলে কীর্ত্তন গাহিতেছেন। পিছনে দীনু মিস্ত্রী, বুজিরাম, পীতাম্বর, রজনী, সদয় রাণা প্রভৃতি ত্রিশ চল্লিশ জন উচ্চ কণ্ঠে নামের রোল তুলিয়াছেন। হরিদাস কাঁশারী ও নটবর মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। গোপী, মহেন্দ্র, বিপিন, অপিন প্রভৃতি অল্প-বয়স্কগণ ঘন ঘন উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতেছেন। মাঝে, ডোম

ভক্তদের নিজ হাতের তৈয়ারী সুন্দর রূপে ফুলের সাজে সজ্জিত একটি ডুলিতে, বস্ত্রাবৃত প্রভুবন্ধু দোদুল্যমান। কতজন সারি সারি গ্যাসের আলো কাঁধে লইয়া দুইপাশে চলিতেছে। কতজন আটা সোটা স্কন্ধে লইয়া আগে আগে ছুটিতেছে। কতজন রাশিকৃত লাজ বর্ষণে পথ ঘাট ঢাকিয়া দিতেছে। দীনহীনদের কুটিরে দীননাথ জগদ্বন্ধুসুন্দর আসিতেছে। আনন্দ প্রবাহে প্রেমের বাতাস উল্লাসময় তরঙ্গ তুলিতেছে।

এমনি সময়ে গভীর কণ্ঠের "হরি-হরিবোল" ধ্বনিতে রামবাগান স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সবাই দেখিল, নয়নে বিগলিত ধারা হরিবোলা ঠাকুর চম্পটী আসিয়াছেন। নামের গৌরবে প্রেমের ফোয়ারা ছুটাইয়া উদয় হইয়াছেন। বৎসর ব্যাপী টহল যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতে, অন্তরে অন্তর্য্যামীর সুস্পষ্ট ডাক শুনিয়া, মত্ত সিংহ প্রায় অতুলচন্দ্র চম্পটী কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। নামের উল্লাস যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সকলের হৃদয়েই বিপুল আনন্দের উদয় হইল।

তিনকড়ির যে গৃহটিতে প্রভু বন্ধুসুন্দর পূর্ব্বে একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই গৃহের পবিত্রতা তিনকড়ি এ যাবৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। প্রতাপচন্দ্র, হরিদাস মোহন্তকে লইয়া ডোম ভক্তদিগকে প্রত্যহ কীর্ত্তনাদি শিক্ষা এই গৃহে বসিয়াই করিতেন। প্রভুর ইচ্ছাতেই এই গৃহে প্রত্যহ হরিসভা বসিত। প্রভুর বাক্যানুসারে হরিসভায় "হরিনাম হরিকথা ও হরিকীর্ত্তন" ব্যতীত আর কোন কাজ হইত না। সেই গৃহেই প্রভুবন্ধু আসন গ্রহণ করিলেন। গরীব ভক্তদের আনীত

ফল মূল সাদরে গ্রহণ করিলেন। প্রতাপচন্দ্রের দ্বারা বহু পিঠা ও মিষ্টি দ্রব্য বিতরণ করাইলেন। মহামহোৎসবে ডোমপল্লী মুখরিত হইল। অতুলচন্দ্র নয়ন জলে ভাসিয়া সবাইকে বুকে করিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। পরমভক্তের স্পর্শে সকলেই যেন প্রভুর স্পর্শ-সুখই অনুভব করিলেন।

সকল কার্য্য সমাধান হইয়া গেলে অতুলচন্দ্র প্রাণবন্ধুহরির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বন্ধুসুন্দর তাঁহাকে বসিতে বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রসাদ হাতে দিলেন। পদ্মহস্তের অর্পিত মহাপ্রসাদের আস্বাদ করিতে করিতে অতুলচন্দ্র ঘন ঘন পুলকিত হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

"তোমরা কীর্ত্তন মঙ্গল কর—শীঘ্রই আসিব।" প্রতাপ, হরিদাস তিনকড়ি প্রভৃতি সকল ভক্তদিগকে এই আশ্বাস বাক্য দিয়া প্রভুবন্ধু অতুলচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া শিয়ালদহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যেমনি আসা, তেমনি যাওয়া। ভক্তগণ ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্তগণকে ব্যথা দিয়াই যে তাঁহার সুখ! ক্ষুধা বাড়াইতে বিরহ বেদনার মত শক্তিশালী কেহই নহে। তাই এ লীলা।

যথাঽধনো লব্ধধনে বিনষ্টে।
তচ্চিন্তয়াঽ ন্যন্নিভৃতো ন বেদ॥

—শ্রীশুক

মহাপুরুষ দর্শন

কৃষ্ণ কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥

—শ্রীকৃষ্ণ দাস

শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া বন্ধুসুন্দর অতুলচন্দ্রকে টাকা দিলেন। একখানি প্রথম শ্রেণীর ও একখানি তৃতীয় শ্রেণীর পাবনায় টিকিট করিতে আদেশ করিলেন।

প্লাটফর্মে প্রবেশ করিয়া অতুলচন্দ্রের হাতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটখানি দিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিতে বলিলেন। স্বয়ং প্রথম শ্রেণীর কামরাতে গিয়া বসিলেন। কুষ্টিয়া ষ্টেশনে নামিয়া প্রভুবন্ধু অতুলচন্দ্রকে লইয়া পাবনাগামী ষ্টীমারে উঠিলেন। আপনি প্রথম শ্রেণীর কেবিনে বসিলেন। অতুলচন্দ্র ডেকে বসিয়া রহিলেন। অপরাহ্নে ষ্টীমার পাবনার ঘাটে ভিড়িল। শ্রীবন্ধুহরি ষ্টীমারের রেলিংএর নিকট বস্ত্রাবৃত অবস্থায় দাঁড়াইলেন। অতুলচন্দ্র আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। তখন ঘাটের উপর বহুলোক আত্মীয় স্বজনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। বন্ধুহরি জনৈক কিশোর বয়স্ক বালককে দেখিয়া বলিলেন, "ঐ যে বালকটিকে দেখিতেছেন, উহার ভাব অপূর্ব্ব। উহার সম্বন্ধে লিখিলে একখানি গ্রন্থ হয়।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের এতখানি প্রশংসা বাক্য শুনিয়া অতুলচন্দ্র সেই ভাগ্যবান কিশোরটির প্রতি নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন অতি সুপুরুষ। ঢল ঢল চাহনী।

দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। ঘাটে অবতরণ করিয়া বন্ধুসুন্দর অতুলের হাতে একখানি নামাবলী দিয়া, স্মিতহাস্য সহকারে কহিলেন "এই নামাবলীখানি ঐ বালকের মাথায় জড়াইয়া দিয়া, কোনও দিকে না চাহিয়া আমার নিকট চলিয়া আসিবেন।" এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে সহরের রাস্তা ধরিলেন। অতুলচন্দ্রও যথাযথভাবে প্রভুর আদেশ পালন করিয়া অতিকষ্টে আসিয়া সহরের পথে বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহার দিকে পরম কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বন্ধুসুন্দর অতি মধুর ভাবে বলিলেন "চলুন, এইবার আপনাকে মহাপুরুষ দর্শন করাইব।"

"শিব, ওকে নাও"

"এই রঘুনাথে আমি সঁপিলু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে ইহার কর অঙ্গীকারে॥" —শ্রীকৃষ্ণ দাস

সহরের প্রান্তে একটি নির্জ্জন স্থান। একটা পুরাতন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন অদ্ভুত মনুষ্য। তাহার মস্তকে কয়েকটী মাত্র জটা। গোঁফগুলি ছাটা। সাদা বড় বড় দাড়ী। উপর হাতে কয়েক গাছি লোহা পিতলের চুড়ী। একটি ত্রিশূল আন্নাভাবে ধরিয়া আছেন। গায়ে একটা মলিন শতছিন্ন কন্থা। কটিতে কৌপীন। মুখখানি হাসি হাসি যেন সকলেরই পরিচিত প্রিয়জন। বয়স আন্দাজ করা সম্ভব নয়। জগৎসুন্দর নিকটে আসিবামাত্র ক্ষেপা উল্লাসে বলিয়া উঠিল, "জগা এলি!

আয়! সঙ্গে কে, অতুল! আয় আয়, তোর কথাই ভাব্‌তে-ছিলাম।"

এ ক্ষেপাকে অতুলচন্দ্র পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, তাই তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। এ ক্ষেপাকে আমরা বহুবারই দেখিয়াছি, অনেক পরিচয় পাইয়াছি। তবে অতুলকে মহাপুরুষ দেখাইতে প্রভুবন্ধু যে এই হারাণ ক্ষেপার কাছেই আনিবেন, ইহা আমরাও পূর্ব্বে ভাবিতে পারি নাই। অতুলচন্দ্র মনে মনে বুঝিলেন, এই সেই মহাপুরুষ। প্রভু যাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। অতুল সম্ভ্রমে ভূলুণ্ঠিত হইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু কহিলেন "শিব, ওকে তুমি নাও। তোমাকে দিতেই ওকে আন্‌লাম।"

শিব জগৎসুন্দরের হাত ধরিয়া টানিয়া একটা গোফার ভিতরে লইয়া গেলেন। সমস্ত রাত্র দুইজনে সেখানেই কাটাইলেন। কত কি কথা! কত হাসি, কত আনন্দ কত ভাষা. কত ভঙ্গী, কত ছন্দঃ, কত রঙ্গ, কে বুঝিবে! বাহিরের রোয়াকে শুইয়া শুইয়া অতুলচন্দ্র কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বুঝিবেন কিরূপে? এ যে অপ্রাকৃত রাজ্যের অপ্রাকৃত ভাষা, অপ্রাকৃত আস্বাদন। তবে বিষয় কি, আলাপন কিসের, ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, অন্তরে অন্তরে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রভাতে শিবের ত্রিশূলের স্পর্শে অতুলের নিদ্রা ভাঙ্গিল। "ওঠ রে ওঠ।" অতুল উঠিয়া দেখিলেন, শিব নদীর চড়ায়

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

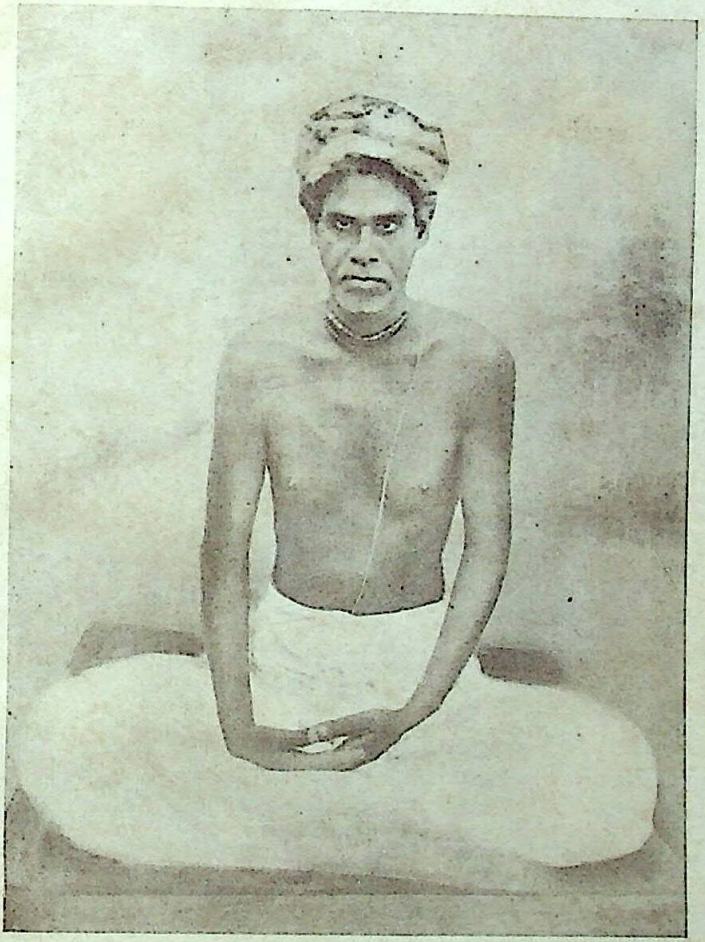

শ্রীঅতুল চন্দ্র চম্পটী

যাইতেছেন। তাঁহাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু, প্রভু কই? তিনি কথা না বলিয়াই পলায়ন করিয়াছেন। প্রভুকে না দেখিয়া অতুলচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া শিবকে প্রভুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু উত্তর দিবে কে? শিব আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছেন। একবার তাঁহার দিকে চাহিলেন মাত্র। সে দৃষ্টিতেই একটা পরম আবিষ্টতা! অতুলচন্দ্র তাঁহার অনুগমন করিয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। স্নানাদি সমাপন করিয়া অতুল দেখিলেন, শিব নদীর মধ্যে নগ্ন হইয়া সাঁতার খেলিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে তীরে উঠিয়া একটা শতছিন্ন আলখেল্লা পরিলেন। একটা কাঁথা গায়ে জড়াইলেন ও ত্রিশূলটী হাতে লইলেন। তারপর সহরাভিমুখে চলিলেন। অতুল ছায়ার মত সঙ্গেই আছেন।

শিব বাজারে প্রবেশ করিলেন। একটা কুম্ভকারের দোকানে ঢুকিয়া অবোধ্য ভাষায় চীৎকার করিতে করিতে তাহার স্তূপীকৃত হাঁড়ির উপর ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করিয়া তিনটী হাঁড়ি একেবারে চূর্ণ করিলেন। কুম্ভকার ছুটিয়া আসিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া শিবের চরণে প্রণত হইল। শিবের হাতে কয়েকটি ফল ও কিছু মিষ্টি দিল। শিব তাহা হইতে কিছু খাইলেন, কিছু অতুলকে দিলেন, কয়েকটি কদলী ঝুলির মধ্যে রাখিলেন।

তারপর অতুলের দিকে চাহিয়া শিব বলিলেন, "খা'লো,'পাড়ে বঙ্কু চাঁড়ালের পাতের ভাত খা'গা। সে, না কর্‌লেও খা'বা। আমার কথা শুন্‌বা। বাণের বাণ মহাবাণ। হাঁ, জগার কথা,

হাঁ॥" ক্ষেপার কথা অতুল কিছু বুঝিলেন, কিছু বুঝিলেন না। তখন পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক ভদ্রলোক অতুলচন্দ্রকে ক্ষেপার কথাগুলির তাৎপর্য্য কিছু বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ইনি একজন মহাসাধু। হিন্দুরা বলে হারাণ ক্ষেপা, বুড়োশিব। মুসলমানেরা বলে হারাণ ফকীর। ইনি যার দোকানে যেদিন কিছু লোকসান করেন, তার সেদিন খুব বিক্রয় হয়। ইনি যাকে মারেন, তার ভাল হয়। যাকে গাল দেন, সে উদ্ধার হয়। নদীর ওপারে একজন চণ্ডাল ভক্ত আছেন। তাঁহার নাম বঙ্কুচরণ মণ্ডল। উনি আপনাকে তাঁহার পাতের ভাত খেতে বলিতেছেন। তিনি আপনাকে ব্রাহ্মণ জানিতে দিবেন না। তথাপি যেমন করিয়া হউক একটুও খাইবেন। তারপর যাহা বলিলেন, বুঝা গেল না। মোটের উপর ও'র কথা না শুনিলে রেহাই নাই। শুনিলে মঙ্গলই হয়। আমরা ও'র আদেশ পাবার জন্য সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু তেমন ভাগ্য কদাচিৎ লাভ হইয়া থাকে। আজ আপনি আদেশ পাইয়াছেন। আপনি ভাগ্যবান।"

"আমের লোভে"—আলমপুর

"শতেক জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
'আর কিছু আছে' বলি গোবিন্দে পুছিল।"—শ্রীকৃষ্ণদাস

জীবনের একটা বিশেষ ক্ষণে—যখন বুড়ো শিবের আদেশে অতুলচন্দ্র একটা কঠোর সমস্যার সম্মুখীন—তখন তাঁহাকে সম্পূর্ণ একাকী রাখিয়া শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর কুষ্ঠিয়া চলিয়া আসিলেন। কৃপা-শুদ্ধ নিজ বিবেক বুদ্ধিই অতুলের পথপ্রদর্শক হউক—ইহাই যেন প্রভুবন্ধুর অভিপ্রায়। শেষরাত্রে তিনি এই লুকোচুরি খেলিলেন।

কুষ্ঠিয়া পৌঁছিয়া বন্ধুসুন্দর পদব্রজে বরাবর দক্ষিণ মুখে চলিতে লাগিলেন। কেহই জানে না, হয় তো বা নিজেও জানেন না, কোন্ ভক্তের প্রবল প্রীতির আকর্ষণে পাঁচ ক্রোশ পথ পদব্রজে চলিতেছেন। ধীরে, মন্থর গমনে, স্বানুভাবানন্দে পথ চলিতে চলিতে, অপরাহ্ন-বেলা বন্ধুসুন্দর আলমপুর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বাল্যে আলমপুরের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন। পড়ার ছলে মাত্র কয়েক মাস ছিলেন। তন্মধ্যেই কতিপয় প্রিয় জনের হৃদয়ে এমনই ভাবে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়াছেন যে, মাঝে মাঝে সেখানে না আসিলেই চলে না। যাঁহারা ভোলেন না, তাঁহাদিগকে কখনও ভুলিতে পারেন না—এই ত চিরদিনের স্বভাব।

আলমপুর একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। বহু প্রাচীন জমিদারের বসবাস আছে। রায়ের বাড়ী, লাহিড়ী বাড়ী ও ভাদুড়ী বাড়ী,

এই তিন জমিদার বাড়ীই নামজাদা। সাধারণতঃ, গ্রামদেশীয় জমিদারের মধ্যে যেমন হিংসা দ্বেষ রেষারেষি থাকে, এই তিন জমিদারদের মধ্যে তাহা বিন্দুমাত্র ছিল না। ইহার একটী প্রধান কারণ, একটি "লক্ষ্মীনারায়ণ" বিগ্রহ ছিলেন এই তিন পরিবারেরই কুল দেবতা। ইনি এই তিনটী বিরাট জমিদার পরিবারকে একটি সূত্র দ্বারা গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন যাঁহার বাড়ীতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবার পালা পড়িত, তখন তাহার বাড়ী প্রত্যহই মহোৎসব বসিত। গ্রামের সমস্ত অতিথি অভ্যাগত ও সকল সরিকদের বাড়ীতে নবাগত জামাতারা সেই মহোৎসবে প্রত্যহই নিমন্ত্রিত হইতেন। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরও কয়েক-বার আলমপুর গ্রামে পদার্পণ করিয়াছেন। যখন যাঁহার বাড়ীতে সেবার পালা পড়িত, তখন তাঁহার অতিথি স্বরূপ থাকিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করিতেন।

বন্ধুসুন্দর আলমপুর প্রবেশ করিয়া বরাবর পরম ভক্তিমান শ্রীযুত তারাকান্ত লাহিড়ীর গৃহে উপনীত হইলেন। ঐ সময় তাঁহার ভাগ্যেই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবার পালা ছিল। বন্ধুসুন্দরকে দর্শন করিবা মাত্র বয়োবৃদ্ধ তারাকান্ত আনন্দে অধীর হইলেন। "জগৎ এসেছে, ওরে, জগৎ এসেছে" বলিয়া পরমোল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে ডাকিতে লাগিলেন।

"জগৎ, গাছের আম পাকা ধরিয়াছে অবধি নিত্য দু'বেলা তোমার কথা ভাবি। ভাল আম লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ লাগিলে বউদের বলি, তোমার উদ্দেশ্যে তুলসী তলে ভোগ দিয়া রাখিতে। ওরা প্রায়ই দেয়।"

লাহিড়ী মহাশয়ের পরম বাৎসল্যপূর্ণ কথা শুনিয়া বন্ধু-সুন্দর মধুর হাসি হাসিয়া ছোট বালকের মত বলিলেন, "আপনার আমের লোভেই তো এ'লাম। তুলসী তলে যে আমাকে আম দেন, তা' খেয়ে খেয়ে আরও খাবার লোভ জাগিল। তাই তো এ'লাম।"

জগৎসুন্দরের পরম লালিত্যপূর্ণ ভাষা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের নয়নদ্বয় সিক্ত হইয়া উঠিল। সেই তুলসী তলার ভোগ সত্যসত্যই জগতের কাছে পৌঁছে শুনিয়া বাড়ীর বউরা মেয়েরা সবাই আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। "জগতকে আম দেও, আম দেও" লাহিড়ী মহাশয় পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। তাঁহার পরম আদরে ও গভীর স্নেহে বন্ধুসুন্দর দিশাহারা হইয়া গেলেন। কত আম আসিল, কত আম খাইলেন! তবু লাহিড়ী দম্পতির তৃপ্তি নাই। ভক্তের দেওয়া "ভক্ত্যুপহৃত" দ্রব্য কত আদরে আস্বাদন করিলেন। আমের সঙ্গে মাখান যে প্রীতিরস, তাহা আস্বাদন করিয়া প্রীতির দেবতা আনন্দে ফুলিতে লাগিলেন। ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিতে লাগিলেন। "আরও দেও আরও দেও" বলিতে লাগিলেন। সে অপূর্ব্ব বাল্যভাব দেখিতে বাল্য সঙ্গীরা সবাই আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

তারাকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র রাখালচন্দ্র বন্ধুসুন্দরকে বড় ভালবাসেন, তিনি আসিলেন। ভাদুড়ী বাড়ীর মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র আসিলেন। রায়ের বাড়ীর নগেন্দ্র, বিনয়, সুরেন্দ্র, ফণীন্দ্র সবাই আসিলেন। লাহিড়ী হীরালাল আসিলেন। সবাই আসিয়া

প্রিয় বন্ধুসুন্দরের চারিদিকে দাঁড়াইলেন। বন্ধুসুন্দর সকলকে সহাস্যবদনে আপ্যায়ণ করিলেন। বলিলেন, "কাল চাপাই-গাছির বিল দেখ্‌তে যাব রে। সবাই যার যার ঘোড়া লইয়া সকালে আস্‌বি। সেই বড় ঘোড়াটায় আমি উঠ্‌বো।"

সকলেরই আনন্দ। পরদিন সকলে সাজিয়া আসিলেন। সকলে নিজ নিজ ঘোড়ায় উঠিলেন। বন্ধুসুন্দর একটী বড় ঘোড়ায় উঠিবেন। ঘোড়াটার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন "ওরে, এত বড় ঘোড়ায় তো উঠ্‌তে পারবো না।"

"তবে ছোট একটায় উঠ" সঙ্গীরা বলিলেন। "না—কেমন যেন এই ঘোড়াটাই পছন্দসই হইল। এইটাতেই উঠিবার ইচ্ছা হইতেছে। তোরা আমায় তুলে দে।"

রায় সুরেন্দ্রকুমার বলিলেন "জগৎ, তোমাকে ধরিয়া তুলিয়া দিতে আমাদের ভয় করে। তোমার গায়ে তো হাড় নেই, কেবল এক রাশ তূলার ঢিপি।"

সুরেন্দ্রকুমার বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতেন। তাঁহার স্নেহময় ব্যবহারে বন্ধুসুন্দর আনন্দে ভাসিতেন। "তোরা ধর, আমি শক্ত হ'ব" বলিয়া বন্ধুসুন্দর দু'হাত বাড়াইয়া দিলেন—পরম মধুর রাখালিয়া ভাবে প্রিয়সঙ্গীরা বন্ধুধনকে ঘোড়ায় তুলিয়া দিলেন। দশ বারজন ঘোড়সোয়ার সঙ্গীসহ বন্ধুসুন্দর চাপাইগাছির বিলের দিকে চলিলেন। বীর পুরুষের ন্যায় ঘোড়ার লাগাম টানিয়া বন্ধুসুন্দর সকলের আগে আগে অগ্রসর হইলেন।

বিলের নিকটে আসিয়া সকলে ঘোড়া হইতে নামিলেন।

বিলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। তদ্দর্শনে বন্ধুসুন্দরের পরাক্রান্ত ধাম ব্রজের কালিন্দী তটের স্ফূর্ত্তি হইল। বন্ধুসুন্দর কীর্ত্তন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে কোথাও যাইতে হইলে, সঙ্গে করতাল রাখিতে হয়, ইহা প্রিয়জনদের অনেকেরই জানা। যাঁহাদের সঙ্গে করতাল ছিল, তাঁহারা করতাল বাজাইলেন। যাঁহাদের সঙ্গে ছিল না, তাঁহারা হাতে তালি দিতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দরের রচিত মধুমাখা পদ কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

হাস লো যমুনে হাস, হাস ও চারু বদনে
মিশাব নয়ন নীর তোর নীল নীর সনে।
(মোরা নীরবে কাঁদি দুজনে) (মোরা নীরবে হাসি দুজনে)
(আয় আয় সখী)
তোমার তীরেতে আসি বঁধু বাজাইত বাঁশী
পাগল করিত বাঁশী নব ব্রজ বধূগণে।
(তা'রা ছুটিত ছুটিত) (শ্যামের বাঁশী শুনে)
ধাইত গোপিনী সব শ্যামচাঁদ দরশনে।
(তারা সবে ভ্রমিত কাননে) (তারা অন্বেষিত প্রাণধনে)
(তোর পড়ে কিনা পড়ে মনে) (বাঁকা সখার কথা)
শুনি শ্যাম বেণু গান তুমি বহিতে উজান ;
ত্যজি নিজ কুলমান কিশোরী পশিত বনে।
(রাই আসিত আসিত) (শ্যাম অভিসারে)
মিলিতেন কমলিনী শ্যাম নটবর সনে।

(তুমি দেখতে দোঁহে একাসনে) (তুমি ধন্য করিতে নয়নে)
(তোমার দাস জগদ্বন্ধু ভণে) (ওলো ও যমুনে)

বিলের তীরে অপূর্ব্ব কীর্ত্তনের রোল আকাশে বাতাসে অপ্রাকৃত স্পন্দন তুলিল। বন্ধুর নয়ন কমল হইতে বহমান জলধারা স্পর্শে বিলের জলরাশি পবিত্র হইল।

অপর এক দিবস বন্ধুসুন্দর প্রিয় সঙ্গীদের লইয়া এই বিলে নৌকায় বাইচ্ খেলিতে আসেন। কেহ দাঁড় টানেন, কেহ হাল ধরেন, কেহ বৈঠা লয়েন। সবাই মিলিয়া প্রিয়বন্ধুকে লইয়া নৌকাবিহার করেন। বন্ধুসুন্দর নৌকার মধ্যস্থলে অঙ্গে বস্ত্র ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকেন। চারিদিকে তুমুল কীর্ত্তন চলে। কীর্ত্তনের তালে তালে বন্ধুসুন্দরের অঙ্গ টলমল করিতে থাকে। শ্রীমুখারবিন্দে বারিবিন্দু ঝলমল করিতে থাকে। বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া পুলক-কদম্ব ফুটিয়া উঠিতে থাকে। ভক্তগণ বন্ধুর আদরের রচিত পদ কীর্ত্তন করেন,—

হা কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ন'দে সুধাকর রে।
শচীর জীবন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণেশ্বর রে॥

গান গাইতে গাইতে সকলেরই প্রাণে জীবন্ত বিশ্বাস জাগিয়া উঠে—"নদে সুধাকর" তাহাদের মধ্যস্থলেই বসিয়া আছেন। বাইচের নৌকা ঘাটে আসিলে জননীরা সে "শচীর জীবন"কে নিজ নিজ জীবনধন মনে করিয়া হুলুধ্বনির রোল তুলিয়া ধূপ ধূনার গন্ধ ছড়াইয়া গৃহে তুলিয়া লন। কুলবতীরা অবগুণ্ঠনের আড়াল হইতে সে "বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণেশ্বরের" মুখ-সুধাকর দর্শন করতঃ অপলক নেত্রে চাহিয়া রয়। তাদের বুকে ঐ চরণে

চিরদাসী হইবার সাধ জাগিয়া উঠে। আলমপুর গ্রাম আনন্দে টলমল করিতে থাকে। মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণও আনন্দে হাসিতে থাকেন।

ধন্য আলমপুর। ধন্য আলমপুরের আম। ধন্য আলমপুরের নর নারী, বন্ধু যাদের প্রাণারাম। বন্ধুহরির আনন্দ বিধানের জন্যই বুঝিবা এদের মর্ত্ত্যে প্রকাশ। বন্ধুসুন্দর একদিন প্রিয় দেবেন্দ্র ভাদুড়ীকে বলিয়াছিলেন, "দেবেন, এই যে দেখ আলমপুর এত আনন্দময়, এক সময় কিছুই থাকিবে না, সব শ্মশান হইয়া যাইবে।" সত্য সত্যই বন্ধুসুন্দর আপনা ঢাকা দিবার পর হইতেই আলমপুর শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তাঁরই নিত্য প্রিয় বস্তু তাঁরই সঙ্গে আসে যায়, হাসে খেলে। লীলাকেতন লীলা কৌতুকীর চিদ্বিভূতিই।

সমস্যা ও সমাধান

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

বঙ্কু মণ্ডল কৃষ্ণভক্ত, কিন্তু জাতিতে সে নমঃশূদ্র। তাহার পাতের প্রসাদ খাইতে হইবে এইরূপ কঠোর আদেশ হইয়াছে অতুলচন্দ্রের উপরে। আদেশটি করিয়াছেন স্বয়ং বুড়ো শিব, যাঁহার হাতে হাতে অতুলচন্দ্রকে সমর্পন করিয়াছেন, প্রভুবন্ধু নিজে। অতুলচন্দ্র তাহাকে গুরুবুদ্ধিতে মনে মনে আত্মনিবেদন

করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কুমারকে নমঃশূদ্রের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ আহার করিতে বলার মত কঠোরতম আদেশ আর কিছুই হইতে পারে না। অতুলচন্দ্র ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন। একদিকে গুরু ও মহতের আদেশ, অপরদিকে দুশ্ছেদ্য সামাজিক বন্ধন। অতুলচন্দ্র জীবনে অনেক কঠোরতা করিয়াছেন। কিন্তু আজকের মত এরূপ সুদুঃসাধ্য সমস্যার মধ্যে আর বুঝি কোনও দিন পড়েন নাই।

সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দুই ভূমির দুইটি বিরোধী আদর্শের সংঘাত কিছু সময়ের জন্য অতুলচন্দ্রকে নীরব করিয়া দিল। এই সময় বন্ধুসুন্দর নিকটে থাকিলে অতুলের অনেক সাহায্য হইত। সময় বুঝিয়া তিনি লুকাইয়াছেন। প্রাজ্ঞ অতুলচন্দ্র ভাবিলেন, আমার সমস্যার সমাধান আমাকেই করিতে হইবে। আমার পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর আমাকেই লিখিতে হইবে। বুঝি বা, এই জন্যই জগৎসুন্দর আমাকে একা ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিরূপ উত্তর করি তাহা তিনি দেখিতে চান। অতুলচন্দ্র ঠিক করিলেন, কোনও পরীক্ষায় তিনি কোনদিন অকৃতকার্য্য হন নাই। আজও হইবেন না। অতুল ভাবিলেন, সামাজিক নীতি হইতে আধ্যাত্মিক নীতির স্থান নিশ্চয়ই ঊর্দ্ধে। ঊর্দ্ধে উঠিতে গেলে নিম্নকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আকাশে উড়িতে গেলে মাটীর সংস্পর্শ ছাড়িতেই হইবে।

অতুলচন্দ্র ভাবিলেন, বঙ্কু মণ্ডলের দেহ নীচকুল জাত। তাহার আত্মা "ভক্তিরস-ভাবিত।" আমার দেহ উচ্চ বংশ জাত কিন্তু আমার আত্মা ভক্তি-বর্জ্জিত। আমি যদি দৈহিক বা

সামাজিক মর্য্যাদা লোভী হই, তবে আমার সমাজ ধর্ম্মের কাছে নত হওয়া উচিত। আর, আমি যদি সুদুর্ল্লভ ভক্তিরস-লোলুপ হই, তাহা হইলে আমার ভক্ত-কৃপানুসন্ধান করাই শ্রেয়ঃ। শাস্ত্রেও শুনিয়াছি,

ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত পদ জল।
ভক্ত ভুক্তশেষ এই তিন মহাবল॥
এ তিনের সেবা হ'তে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব শাস্ত্র ফুকারিয়া কয়॥"

সর্ব্বোপরি শিবের আদেশ। স্বয়ং বন্ধুসুন্দর যাঁহাকে "মহাপুরুষ" আখ্যা দিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার পরম মঙ্গল কামী।

হরি-হরিবোল! অতুলচন্দ্রের বিচার পর্ব্ব শেষ হইল।

শিবের চরণে প্রণত হইয়া অতুলচন্দ্র মহোল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে হরি-হরিবোল ধ্বনি করিলেন। সহরের রাজপথ ধরিয়া চলা সুরু করিলেন। মাঝে মাঝে হরিধ্বনি করেন। মাঝে মাঝে পথিকের কাছে বঙ্কু মণ্ডলের বাড়ীর খোঁজ করেন। মাতা-হাতীর মত অতুল রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে, তাই এত আনন্দ।

ভক্তোচ্ছিষ্ট গ্রহণ

"আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হইল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥"
—শ্রীকৃষ্ণ দাস

নদীর তীরে একখানি ছোট বাড়ী। তৃণাচ্ছাদিত দুই তিন খানা ঘর। সম্মুখের দিকে একপাশে গরুর ঘর, অপর দিকে ছোট একটি ঠাকুরঘর, মাঝখানে তুলসী বেদী। ফুলমালায় সজ্জিত মৃণ্ময় যুগল মূর্ত্তি ঠাকুরঘর আলো করিয়া আছেন। সমস্ত বাড়ীখানি গোবরে লেপা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বঙ্কু মণ্ডলের আহার বিহার সদাচার সবই বৈষ্ণবোচিত। সবেমাত্র স্নান পূজা সারিয়া বঙ্কু প্রসাদের থালা লইয়া ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে। রাধারাণীর জয় দিয়া দুই এক গ্রাস মাত্র অন্ন মুখে তুলিয়াছে। হঠাৎ বাহিরে উচ্চ রোলে হরি-হরিবোল ধ্বনি শুনিয়া সে বাহিরের দিকে তাকাইল। দেখিল অপরিচিত জনৈক যুবক উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে করিতে তাহার বাড়ী আসিতেছে। বঙ্কু আহার ত্যাগ করতঃ উদ্‌গ্রীব হইয়া তাকাইয়া রহিল।

যুবকটি বঙ্কুর অপরিচিত। কোনদিন তাঁহাকে দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়ে না। কিন্তু দেখিবার চোখ বঙ্কুর আছে। যাঁহাকে অনেকেই পাগল মনে করে, বঙ্কু তাঁহাকে দেখিয়াই পরম ভক্ত বলিয়া চিনিল। তাঁহার নয়নের ধারা বিশুদ্ধ ভক্তির পরিচয় দিতেছিল। ঊর্দ্ধে উত্তোলিত বাহু ভাব-বিহ্বলতার খবর

দিতেছিল। স্কন্ধে উজ্জ্বল উপবীত ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় ঘোষণা করিতেছিল। বঙ্কু আর ঠিক থাকিতে পারিল না। হাত ধুইয়া আহার ত্যাগ করতঃ উঠিয়া পড়িল। অতুলচন্দ্র বঙ্কুর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই বঙ্কু ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। চরণের ধূলি মাথায় লইতেই বঙ্কু যেন কেমন হইয়া পড়িল। ঊর্দ্ধ বাহু করিয়া অতুলচন্দ্রের সঙ্গে হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বঙ্কুর সাধ্বী পত্নী স্বামীকে পরিবেশন করিতেছিল। তাহার হাতের হাতা হাতে রহিল। দৃশ্য দেখিয়া সে আনন্দে কদলী পত্রের মত কাঁপিতে লাগিল।

অকস্মাৎ অতুলচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া বঙ্কুর বারান্দায় উঠিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাহার পরিত্যক্ত থালা হইতে থাবা থাবা অন্ন তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্কুর স্ত্রী সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। স্ত্রীর চীৎকারে বঙ্কুর আবেশ ভাবটা কাটিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া সে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদকম্প উপস্থিত হইল। "কি করেন কি করেন" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বঙ্কু অতুলচন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিল। অতুলচন্দ্রের উদ্দেশ্য ইতিপূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া বঙ্কুর উঠানে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বঙ্কু তাঁহার চরণের নীচে পতিত হইয়া পবিত্র রজঃ গায় মাখিতে লাগিল। বঙ্কুর ক্ষুদ্র কুটীর দ্বারে আজ গোলোকের দৃশ্য প্রকট হইল। ঠাকুরঘরে ঠাকুরও আনন্দে হাসিল। পবনদেব উল্লাসে ঘোষণা করিল,—"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়।"

"চাঁড়ালের ভাত খায়"

"বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা সীমা॥"

—শ্রীকৃষ্ণ দাস

অতুলচন্দ্র আসিয়া শিবের নিকট জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছেন। শুনিয়াই ক্ষেপা তাহাকে বুকের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া মুখে অজস্র চুম্বন করিলেন। তারপর হাতে তালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলেন,—

"ভাল রে ভাল গেল রে গেল হ'ল রে হ'ল।
জগা রে জগা জগা রে জগা জগা রে জগা॥"

অতুলচন্দ্র ক্ষেপার চরণতলে পতিত হইলেন। পরদিন প্রাতে স্নানান্তে শিব অতুলকে সঙ্গে লইয়া বাজারে চলিলেন। দুইপাশে সারি সারি দোকান। মধ্যে রাজপথ দিয়া অতুলের হাত ধরিয়া শিব চলিয়াছেন। এক এক দোকানের সম্মুখে দাঁড়ান, আর চেঁচাইয়া বলেন, "বামুনের ছাওয়াল চাঁড়ালের বাড়ী ভাত খায়।" প্রথমটায় লজ্জা ও সঙ্কোচে অতুলচন্দ্রের মাথা নীচু হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরেই হৃদয়ের দৃঢ়তার উদয় হইল। সংস্কার ও সাধনার সংগ্রামে সাধনাই জয়লাভ করিল। অতুলচন্দ্র ভাবিলেন, শিবের কৃপায় আমার ব্রাহ্মণত্বের অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। ইহা আমার বৈরাগ্য পথের পরম অনুকূল। আমি লুকাইব কেন। আমি ত পথের ফকির। দেহ গেহের

গৌরব ত আমি ত্যাগ করিয়াছি। এখন নামের গৌরবই আমার গৌরব। প্রেম ধর্ম্মের গৌরবই আমার গৌরব। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে কোলে লইয়া নাম দিতে হ'বে বলিয়াই প্রভু আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে শিবের নিকট বৈরাগ্যের শিক্ষানবিশী করাইতেছেন।

আনন্দে মুখ তুলিয়া অতুল হরি-হরিবোল বলিয়া ধ্বনি দিলেন। সেই ধ্বনিতে পাবনার বাজার কাঁপিয়া উঠিল। রাজপথের চারিদিক হইতে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি আসিল। শত শত দোকান হইতে হরিবোল ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসা বর্ষণ হইতে লাগিল। পাবনার বাজারে একটা আনন্দের বন্যা বহিল। অতুলচন্দ্রের প্রথম পাঠ শেষ হইল।

"জগার নাম ল'বি"

শিব অতুলচন্দ্রকে আদেশ করিলেন, নিত্য সহরে নাম দিয়ে বেড়া'বি। অতুল আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। সেদিন সকালবেলা অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। অতুলের ইচ্ছা বৃষ্টির মধ্যেই টহলে বাহির হইয়া পড়িবেন। শিবের কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া অতুল করতাল সংযোগে নাম ধরিলেন,—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যেজন গৌরাঙ্গ ভজে সে আমার প্রাণ রে॥

শিব তখন কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন। অতুলের

ভক্তি গদগদ কণ্ঠে নামের ধ্বনি শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া অতুলের গলাটি জড়াইয়া কাণের কাছে কহিলেন, "তুই জগার নাম বলিস্ না? জগা সাক্ষাৎ—তুই জগার নাম ল'বি।"

অতুলচন্দ্রের সম্মুখ হইতে একটা মহা আবরণ অপসৃত হইয়া গেল। ছোটমামা জগদ্বন্ধু যে কী বস্তু, তাহা এতদিন বুঝিয়াও বুঝিতেছিলেন না। তাঁহার নাম যে রাধাকৃষ্ণ নিতাই গৌরাঙ্গ নামের ন্যায় কীর্ত্তনীয় ভজনীয়, এই সহজ কথাটা এতদিন তাঁহার বুদ্ধিতে আসে নাই। বন্ধুসুন্দর যে সাক্ষাৎ সেই বস্তু, তাহা অতুলচন্দ্রের মাথায় এই প্রথম প্রবেশ করাইলেন বুড়োশিব। নবীন উৎসাহে ও অনুরাগে অতুল গাহিলেন,—

ভজ জগদ্বন্ধু কহ জগদ্বন্ধু লহ জগদ্বন্ধু নাম রে।
যে জন জগদ্বন্ধু ভজে সে আমার প্রাণ রে॥

শিব কখনও লম্ফ দিয়া, কখনও ঢুলিয়া ঢুলিয়া, কখনও গড়াইয়া গড়াইয়া, কখনও উচ্চ বাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া, জগার নামে কাঁদিতে লাগিলেন। এতদিন এ গান এ মন্ত্র শিবের নিকট লুক্কাইত ছিল। এই অবতারে জন সমাজে এই প্রথম "ভজ জগদ্বন্ধু" গীত হইল। অতুলের জীবননাট্যে নূতন অঙ্কের সূত্রপাত হইল। জয় জগদ্বন্ধু।

এই নব নামের নব প্রেরণায় অতুল নব উল্লাসে নাচিয়া গাহিয়া পথ ঘাট পল্লীপাড়া মাতাইয়া তুলিলেন। যে পাবনায় একদিন মহা আসুরিক কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, লীলাশক্তির

ইচ্ছায় আজ সেই দেশেই জগদ্বন্ধু মহানাম মহাউদ্ধারণ গাথা প্রথম গীত হইল। তার-স্বরে নবযুগের নূতন ঘোষণা ঘোষিয়া অতুলচন্দ্র গাহিয়া যায় "ভজ জগদ্বন্ধু কহ জগদ্বন্ধু লহ জগদ্বন্ধু নাম রে। যেজন জগদ্বন্ধু ভজে সে আমার প্রাণ রে!" পথিপার্শ্বে কত লোক দাঁড়াইয়া শুনে। কত লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কীর্ত্তন করে। যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বন্ধু নামে পাগল, অতুলের আর্ত্তি, অশ্রু, আবেগ, তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রীতিতে উদ্দীপনা আনে। তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া গায়, "ভজ জগদ্বন্ধু কহ জগদ্বন্ধু লহ জগদ্বন্ধু নাম রে। যে জন জগদ্বন্ধু ভজে সে আমার প্রাণ রে।" পাবনার পথ ঘাট জয় জগদ্বন্ধু রোলে পূর্ণ হইয়া যায়।

শিব শিবই

"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।"

একদিন অতুলের হৃদয়ে ঈষৎ মায়ার আবরণ নামিয়া আসে, চিত্তে সংশয় জাগে। শিব কি মহাপুরুষ, না পাগল? মহাপুরুষের মত ঐশ্বর্য্য বিভূতি ত কিছুই দেখিনা। অতুলের চিত্ত সন্দেহ দোলায় দোলে। শ্রদ্ধা শিথিল হইয়া আসে। আজ শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ, তাই সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অতুল ফিরিয়াছেন। শিবের গোফার দুয়ারে আসিয়া দেখেন দুয়ার খোলা। শিবের পায়ে একটা স্থানে খানিকটা ক্ষত হইয়াছে। শিব সেই

ক্ষত স্থানটা খুলিয়া শুইয়া আছেন। ভীতিবিহ্বল চিত্তে অতুল দেখিলেন দুইটি ভীষণ আকারের বিষধর সর্প শিবের সেই ক্ষত স্থান চাটিতেছে। দেখিয়াই আর্ত্তনাদ করিয়া অতুল পিছু হটিলেন। সাড়া পাইয়া শিব ধীরে বলিলেন,—"কেডা কান্দে, এথা আয়, ওরে যাঃ। তোরা যাঃ যাঃ।" অতুল দেখিলেন, সর্প দুইটি শান্তশিষ্ট অনুগতের মত ফণা সঙ্কুচিত করিয়া ধীরে ধীরে কোণের গর্ত্তে প্রবেশ করিল। বিস্ময়াবিষ্ট অতুল প্রণাম করিলেন। নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিলেন, শিব সাধারণ মানুষ নহে। শিব শিবই।

সন্ধ্যার আঁধার ঘন হইয়া আসিলে শিব বলিলেন, অতুল আয় আরতি করি। বলিয়াই শিব অন্ধকার কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। অতুল সভয়ে অনুসরণ করিলেন। শিব সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধমুখে উচ্চারণ করিলেন। "জগা রে জগা, গোরা রে গোরা, জগা রে গোরা, জগা! জগা! জগা!" অতুল দেখেন, অন্ধকারে শিবের নৃত্যকালে ঘরময় আলো হইয়া যায়। তার মাঝে বিদ্যুতবরণ কি যেন মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। অতুল কিছুই বুঝেন না। নটরাজের নৃত্যের কথা শুনিয়াছেন, তাই দেখেন। আর ঘন ঘন চক্ষু মুছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক শিহরণ খেলে।

দিন যায়, অতুল নাচিয়া বেড়ায়। কিন্তু তাঁহার অন্তর্হৃদয় বন্ধুসুন্দরের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে বিরহসন্তাপে দহ্যমান হইতে থাকে। বন্ধুহরি কোথায় গেলেন, কবে আসিবেন, শিবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "তুই এখন কলিকাতা যা।

জগা এলে সংবাদ পাবি। সজাগ থাকিস্। তাহ'লেই সাড়া পাবি।" শিবের আদেশে অতুল বিরহ ব্যথা বুকে লইয়াই কলিকাতা চলিয়া আসিলেন ও হরি-হুঙ্কারে কলিকাতার রাজপথ কম্পিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। জয় জগদ্বন্ধু! জয় হরিবোল চম্পটী ঠাকুর !!

চম্পটী ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে আমরা অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি। এইবারে "হরিবোলা"কে কলিকাতার পথে ছাড়িয়া দিয়া আমরা কয়েক মাস পূর্ব্ববর্ত্তী লীলাকাহিনীর অনুস্মরণ করিব।

রমেশচন্দ্রের পথানুসন্ধান

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। —পতঞ্জলি

"ব্রহ্মচর্য্য করিও, করাইও" —শ্রীবন্ধুসুন্দর

চক্রবর্ত্তী রমেশচন্দ্র বন্ধুসুন্দরের বাল্য সঙ্গী। রমেশচন্দ্র বয়সে এক বৎসরের ছোট। এক মায়ের কোলে বসিয়া দুইজনে দুই স্তন্য পান করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলা স্কুলে ক্লাস এইট্ পর্য্যন্ত একত্র পড়িয়াছেন। এ সব কথা প্রথম খণ্ডে তারুণ্যামৃত ধারায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের ব্যাপক

প্রচারণের যুগ। রমেশচন্দ্র সেই দিকে কতকটা আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। Band of Hope নামক একটী যুব সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য হইয়া ছাত্র সমাজে নীতি প্রচারে বেশ উদ্যোগী হইয়া পড়েন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য রমেশচন্দ্র দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হয়েন। তৎপর হইতে রমেশচন্দ্রের চিত্তে নূতন চিন্তার উদয় হয়।

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নিজ জীবনকে গঠিত করিতে না পারিলে অপরকে নীতিকথা শিখান ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় মাত্র। এদিকে রমেশচন্দ্রেরও জীবনে যখন যৌবনের জোয়ার আসিল তখন বক্তৃতার নীতিবাদ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। রমেশচন্দ্র নিজে নিজে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥—শ্রীগীতা

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোরতর পাপ মানুষ কেন করে? কেন শত চেষ্টা করিয়াও ভাল হইতে পারি না? রমেশচন্দ্রের হৃদয় এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু "বার্ষ্ণেয়" কোথায়—উত্তর কে দিবে? রমেশচন্দ্র দিনের পর দিন মলিন হইয়া যাইতে লাগিলেন। পথ কোথায় তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন।

এই সময় প্রাতঃস্মরণীয় অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগ গ্রন্থ রমেশচন্দ্রের হাতে আসিল। তাহাতে অনেক উপদেশ পাইলেন। অনেক ভাল কথা তাহাতে আছে বটে কিন্তু পবিত্র পথে চলার মত একটা বাঁধা পথ, জীবনকে নিয়মানুবর্ত্তী করিবার জন্য একটা

দিনচর্য্যা তাহাতে পাইলেন না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে রমেশচন্দ্রের জীবন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

বকুলাল রমেশচন্দ্রের স্কুল জীবনের সহপাঠী। কলিকাতা আসিয়া দুই জনে দুই কলেজে পড়িতেছেন। একদিন দুইজনে পার্কে দেখা। কিছুক্ষণ আন্তরিক আলাপন ফলে, রমেশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, বকুলালের সঙ্গে তাহার নিজ জীবনের ব্যবধান অনেকখানি। বকুলালের দেহের কান্তি ও মনের শান্তি দুইই লোভনীয়। তাঁহার তুলনায় সে নিজে কত মলিন। বকু কি ভাবে এত উন্নতি করিল রমেশচন্দ্র জানিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "বকু, তুই এত সুন্দর হইলি কি করিয়া? আমি তো জীবনের একটা পথ পাইতেছি না।"

বকু। ভাই, আমি জগদ্বন্ধুর আদর্শ ও উপদেশ লইয়া চলিতেছি। যদি কিছু হ'য়ে থাকে তারই ফলে। তোর জগতের কথা মনে পড়ে না?

রমেশ। মনে পড়ে না? খুব মনে আছে। সেদিনও ফরিদপুর দে'খে এলাম। কয়েকজন সঙ্গী সঙ্গে খোল বাজাইয়া জগৎ সহরের দিকে আসিতেছিল। আমি কয়েকজন ছাত্রবন্ধু লইয়া বাজারের দিকে যাইতেছিলাম। চেহারাটি অতি মধুর, যেন চক্ষে লাগিয়া গেল। সেও একবার আমার দিকে চাইল। মনে হইল যেন চিনিল। কিছু বলিল না।

বকু। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, রমেশ, জগতের উপদেশ মত চলিলে তোর পরম কল্যাণ হবে। আর তার উপদেশ কি! তাকে দেখলে, স্পর্শ করলে, প্রাণে নবজীবন সঞ্চার হয়।

কঠোর তপশ্চর্য্যার দেহ তার, অথচ কি মাধুর্য্যময়। কোন বিলাসিতা নাই, তবু অঙ্গে যেন লাবণ্য গলিয়া পড়ে। নগ্ন পদে চলিলে পা ফাটিয়া রক্ত পড়ে, তবু, তাই চলিবে। আমি সেদিন জোর করিয়া বরারের জুতা কিনিয়া দিয়াছি। পায়ে দিয়ে কি শোভাই হল! তোকে আমার সেই রূপখানা আর সেই ভাবভঙ্গিগুলি দেখাতেই হবে।

রমেশ। জগৎ কলিকাতা এলে কোথায় থাকে?

বকু। কোথায় থাকে জানি না। আমার মেছে মাঝে মাঝেই আসে। আমি দরকার বোধ করিলেই আসে।

রমেশ। এবার এলেই তুই আমায় খবর দিবি।

বকু। নিশ্চয় দেবো। খবর দিলেই কিন্তু চলে আসবি। আসিয়া কিন্তু খুব বেশী সময় থাকে না। বড় চঞ্চল। আমার মেছের ঠিকানা জানতো—৪।১ ছকুখানসামার লেন।

শুভ দর্শন ও কৃপাবর্ষণ

মাঘ মাস। বারশত নিরানব্বই সন। ভৈমী একাদশী। বকুলাল উপবাস করিয়া আছেন। সারা দিন জগতের কথাই ভাবিয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার ধন উদয় হইয়াছেন। বকুলাল বলিলেন, "জগৎ, রমেশকে খবর দেই। বড় মলিন হ'য়ে গেছে। তুমি কিছু উপদেশ দিবে।" বন্ধুসুন্দর মৃদু

রাজেশ শর্মা

হাসিয়া বলিলেন। "আচ্ছা, ডাক।" বকুলালের ডাকে পরদিনই রমেশচন্দ্র মেছে আসেন।

একটা একতালা কোঠা। তার মধ্যে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বন্ধুসুন্দর বসিয়া আছেন। সেই গৃহে রমেশচন্দ্র প্রবেশ করিলেন। রমেশচন্দ্র দেখিলেন—জগদ্বন্ধুর অঙ্গচ্ছটায় ঘরটি আলোময়। রমেশ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। বস্তুর এমনই গুণ, কৃপার এমনই আকর্ষণ যে, রমেশচন্দ্র তখনই মনে মনে ঐ পদে আত্মসমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বন্ধুসুন্দর স্নেহ-মাখান মধুর স্বরে বলিলেন। "রমেশ, আমার দিকে তাকা'স না।" রমেশচন্দ্র অমনি মস্তক নত করিলেন। বন্ধুসুন্দর তখন ধীরে ধীরে রমেশচন্দ্রের চিত্তের ভাব অবস্থা ও জীবনে সংঘটিত ছোটবড় সকল ঘটনা প্রত্যক্ষদ্রষ্টার মত বলিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্র অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। কেন যে তাহার দেহের মনের উন্নতি হয় না তাহা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, ওজঃশক্তির সংরক্ষণই সকল শক্তির উৎস।

রমেশচন্দ্র কাতরভাবে বলিলেন, "আমার কি আর উদ্ধারের উপায় নাই। আমি কি এই ভাবে রিপুর কৌশলে পরাভূত হয়ে, অকাল মৃত্যু বরণ করিব!" পরম স্নেহে সান্ত্বনা দিয়া প্রভু কহিলেন, "রমেশ, নিজের উপর বিশ্বাস হারাস্ না, শুভ সময় এখনও নিঃশেষ হয় নাই। আমার কথা শোন, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, মঙ্গল হবে।" এই কথা বলিয়া প্রত্যহ দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় কতিপয় নিয়ম ও দিনচর্য্যা শিক্ষা দিলেন।

বন্ধুসুন্দর সেদিন ও পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই রমেশচন্দ্র লিখিয়া লইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি কথা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

১। রমেশ, আমি যাহা বলি তাহা মন দিয়া শুনো। আমি যাহা লিখি তাহা মন দিয়া পড়ো। আমি যাহা বলি তাহা নিত্য চিরকাল মনে রেখো।

২। আমি যাহা বলি, তাহা চিন্তা করো। আমার কথায় কাজ করলে তোমাদের প্রতিষ্ঠা। আমার কাজ বহুকাল ব্যাপী ধরাধামে থাকবে।

৩। আত্ম সংযমেই আত্মরক্ষা। সদা পবিত্রতা, সদা নিষ্ঠা। আত্ম শুচিতে, বপু রক্ষা হয়।

৪। নিষ্ঠাই আরোগ্য, অনিষ্ঠাই ব্যাধি ও মৃত্যু। নৈষ্ঠিক হ'লে কেউ তার কাজে বাধা দিতে পারে না।

৫। রাত্রিকাল উপাসনার সময় ভাল। স্বস্তিকাসনে ঊর্দ্ধনেত্রে স্থির হৃদয়ে বসে জপ করিও।

৬। মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহাকে কদাপি প্রশ্রয় দিও না।

৭। মানব জন্ম পাপ করিবার জন্য নহে, কৃষ্ণ সেবার জন্য।

৮। মানুষ কেবল হুজুগ চায় হৈ চৈ ভালবাসে। তোমরা হুজুগ ক'রো না। ধীরে অতিধীরে, মহাপ্রেমে নিষ্ঠার সহিত চলে যাও। হতাশ হ'য়ো না।

৯। তেজ অচল অটল থাকলে, একান্ত ইচ্ছায় মানুষ সবই পারে।

১০। Private Conscienceই ধর্ম্ম।

বন্ধুসুন্দরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতেই রমেশচন্দ্রের মনে হইতে লাগিল যে, তাঁহার দেহে মনে প্রাণে কে যেন একটা শক্তির ডায়নামো পুরিয়া দিল। রমেশচন্দ্র চক্ষের সম্মুখে একটা নূতন জগৎ দেখিতে লাগিলেন। মেছে ফিরিয়া প্রথমেই শয়ন-শয্যা চৌকী, চামড়ার জুতা এই সকল ত্যাগ করিলেন। কম্বল কুশাসন ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। বন্ধুসুন্দরের অনুকরণে রবারের জুতা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। নিত্য গঙ্গাস্নান আরম্ভ করিলেন। হবিষ্যান্ন আহার করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ স্থির আসনে বসিয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিলেন। পড়াশুনাতেও প্রগাঢ়ভাবে মনোনিবেশ করিলেন। মেছে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কিন্তু রমেশচন্দ্র দৃঢ় রহিলেন।

রমেশচন্দ্রের জীবন নদীতে নূতন স্রোত বহিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দেহে অপূর্ব্ব কান্তি ফুটিল। মনে অপার্থিব শান্তির হাওয়া বহিল। হৃদয়ে নবীন উদ্যম উৎসাহ জাগিল। বিচার বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ হইল। নব আলোকে জীবন শতদলের মত ফুটিতে লাগিল। রমেশের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। অনেকেই তাঁহার পথ অনুসরণ করিতে আগ্রহশীল হইয়া উঠিল।

"ইহাকে বলে চন্দ্রভাল"

"রমেশচন্দ্র দর্শিত চন্দ্রভাল বন্ধু"

—স্মরণ মঙ্গলম্

সন্ধ্যা কেবল নামিয়াছে। কলিকাতা সহর কোলাহলময়। হ্যারিসন রোডের একটা মেহ বাড়ীর দোতালার ছাদে রমেশচন্দ্র আপন মনে পায়চারী করিতেছেন। হঠাৎ নীচে রাস্তায় তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দরজা জানালা বন্ধ একখানা ঘোড়ার গাড়ী মেছের দুয়ারে দাঁড়াইল। কে আসিল, দেখিবার জন্য রমেশচন্দ্র নীচের দিকে তাকাইলেন।

রাস্তায় গ্যাসের আলো, কেমন মেটে মেটে, তার মাঝে ছায়া ছায়া। সেই অস্পষ্ট আলোকে রমেশচন্দ্র দেখিলেন একজন শুভ্র-বস্ত্রাবৃত দীর্ঘাকৃতি পুরুষ গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। রমেশচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ খেলিল। একি! এ যে প্রভু আসিয়াছেন!

ছুটিয়া নীচে আসিয়া রমেশচন্দ্র প্রভুকে লইয়া একেবারে ছাদের উপরে গেলেন। অন্য কোথায় বসিতে দিবেন, হঠাৎ যেন ঠিক করিরা উঠিতে পারিলেন না। ছাদে উঠিয়াই প্রভু-বন্ধু কহিলেন, "রমেশ রে, আমি শৌচে যাব।" প্রভুবন্ধু কখনও অন্য লোকের ব্যবহৃত শৌচাগারে প্রবেশ করিতেন না। রমেশচন্দ্র ইহা জানিতেন। তিনি তাড়াতাড়ি একটা মাটীর পাত্র আনাইয়া ছাদের একপার্শ্বে আবরণ করিয়া দিলেন। অল্প

সময় মধ্যে প্রভু শৌচাদি সমাপন করিয়া উঠিলেন। রমেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন।

হঠাৎ যেন কিছু ব্যস্ততার সহিত প্রভু বলিলেন, "রমেশ রে, আমার কপালের দিকে চা' তো।" রমেশচন্দ্র বলিলেন, "কপালের দিকে চা'বো কেন, সেদিনতো নিষেধ করিয়াছ।"

"তা করেছি, কিন্তু আজ একবার তাকা।"

"শেষে আবার বলিবে, নিষেধ ক'রেছিলাম, তবু তাকা'লি কেন?"

"না, তা' বলবো না, আজ একবার তাকা' তো, এখনই"।

বন্ধুসুন্দর বারংবার বলায় রমেশচন্দ্র বুঝিলেন, ইহা পরীক্ষা নহে, যথার্থই অনুজ্ঞা। তিনি শির উত্তোলন করিয়া বন্ধু-সুন্দরের কপালের দিকে তাকাইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া নত হইয়া পড়িল। রমেশচন্দ্র দেখিলেন, বন্ধুসুন্দরের কপালের ঠিক মধ্যস্থলে একটী অতি উজ্জ্বল অথচ অতি স্নিগ্ধ আলো টর্চ লাইটের মত রশ্মি ছড়াইতেছে। তখন ছাদের উপর অন্ধকার হইলেও সে-ই আলোতে শ্রীমুখমণ্ডল ঝলমল ঝলমল করিতেছিল, চারিদিকের অন্ধকারও কিছু ঘুচিয়া যাইতেছিল। রমেশচন্দ্র বিস্ময়ে অভিভূত। কিন্তু বাহিরে তিনি ধীর অচঞ্চল। কোনও বিস্ময় বা কৌতূহলের ভাব তিনি প্রকাশ করিলেন না। রমেশচন্দ্রকে নীরব দেখিয়া ক্ষণকাল পরে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া বন্ধুসুন্দর অতি সুমধুর স্বরে কহিলেন, "ইহাকে কি বলে জানিস্, রমেশ!"

"না, প্রভু, জানিনা।"

"ইহাকে বলে চন্দ্রভাল। এর নাম রাকা শশী। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কপালে আছে। শিবের কপালে অর্দ্ধমাত্র। একথা কাহাকেও বলবি না, বুঝ্‌লি!"

রমেশচন্দ্র নীরব। মনে মনে বলিলেন, "প্রভু, তুমি যে কৃষ্ণ, ইহা আমার কাছে বড় কথা নহে। কৃষ্ণ আমি চিনি না, তোমায় আমি চিনি। তুমি যে সত্যের মূর্ত্তি, সৌন্দর্য্যের খনি, পবিত্রতার আধার প্রেম-বিগ্রহ ইহা আমি দেখিয়া চিনিয়া লইয়াছি। আমার পক্ষে ইহাই সম্পূর্ণ, এর চেয়ে বড় কিছু নাই।"

ভক্তের কাছে হারিয়া গিয়াই ভগবান যেন আর কোন কথা না পাইয়া বলিলেন, "রমেশ রে, তোর নাম ধ্রুবানন্দ।"

রমেশচন্দ্র একটু হাসিলেন। পরে নামটির মাঝে যেন খানিকটা আত্মদর্শন করিয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইলেন।

রমেশচন্দ্র ডাকিলেন, "প্রভু!"

প্রভু সাড়া দিলেন, "ধ্রুব!"

উত্তরাকাশে সমুদিত চির পুরাতন নূতন ধ্রুবের কিরণ রেখা তখন সেই ছাদের উপর গড়াগড়ি দিতেছে। ভক্ত ভগবানের নবায়মান চির-পুরাতন মিলন মাধুরী নিত্য জয়যুক্ত হউক। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

MEDICAL EMPLOYEES' CLUB
CHARLOTTE COLLEGE HOSPITAL

PRESENTED

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী

প্রথম খণ্ড

"প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের এই জীবনীগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। লেখক নিজে একজন ভক্ত। তাঁহার লেখা আগাগোড়া ভক্তিরসে উচ্ছল, ভাব সম্পদে উজ্জ্বল এবং ভাষার বিন্যাস গৌরবে সুললিত হইয়া উঠিয়াছে। এই জীবনীগ্রন্থ সাতটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া গ্রন্থকার আশা করেন। আমরা অন্য অংশগুলি দেখিবার আগ্রহ রাখিলাম। ভক্তি রসপিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই মধুর জীবনী পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।"

—দেশ

১লা শ্রাবণ, ১৩৫৫